ভগবৎপ্রাপ্তির পথ ও পাথেয়

॥ শ্রীহরি ॥

প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ

পরম দয়াময় পরমাত্মার কৃপায় আজ প্রেমের সম্বন্ধে কিছু লেখার সাহস করেছি। অবশ্য আমি এই বিষয়ে নিজেকে অসমর্থ বলেই মনে করি। কেননা প্রেমের যথার্থ মহিমা সম্পর্কে তিনিই কিছু লিখতে পারেন যিনি পবিত্রতম ভগবৎ-প্রেমের রসসমুদ্রে নিমগ্ন হয়ে গিয়েছেন। প্রেমের বিষয়টি এত গভীর এবং কল্পনাতীত যে বিদ্বান এবং জ্ঞানী ব্যক্তিও তার তলে পৌঁছাতে পারেন না, সেই বিষয়ে বলা ও লেখা তো দূরস্থান। শেষ (অনন্তদেব), মহেশ, গণেশ এবং শুকদেব তথা নারদাদি—যাঁদের ভগবানের প্রেমীদের মধ্যে শিরোমণি বলে মানা হয় তাঁরাও যখন প্রেমতত্ত্বের সম্যক বর্ণনা করতে নিজেদের অক্ষম বলে মনে করেন তখন আমার মতো সাধারণ মানুষের আর কথা কী ? অন্তঃকরণে যখন প্রেম-রসের বন্যা বয় তখন মানুষের সকল অঙ্গ পুলকিত হয়ে ওঠে, হৃদয় প্রফুল্ল হয়ে যায়, বাণী রুদ্ধ হয়ে যায়, চোখ থেকে অশ্রুর অজস্র ধারা প্রবাহিত হতে থাকে—এই রকম কথা শাস্ত্র এবং মহাত্মা পুরুষেরা বলে থাকেন, তাঁদের অভিজ্ঞতাও এই রকম। কিন্তু এই সবই প্রেমের বহিরঙ্গের নিদর্শন, অতএব এর বর্ণনাও সম্ভব। হৃদয়ে প্রেমের সমুদ্র যখন উত্তাল হয়ে ওঠে তখন প্রেমী তার মধ্যে নিমজ্জিত হয়ে যায়। সেই অবস্থার বর্ণনা সে নিজেও করতে পারে না। তাহলে অন্যের আর সামর্থ্য কোথায় ? রাম এবং ভরতের প্রেম-মিলনের প্রসঙ্গে তুলসীদাস

নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করতে গিয়ে বলেছেন—

কহহু সুপেম প্রগট কো করঈ। কেহি ছায়া কবি মতি অনুসরঈ॥
কবিহি অরথ আখর বলু সাঁচা। অনুহরি তাল গতিহি নটু নাচা॥
অগম সনেহ ভরত রঘুবর কো। জহঁ ন জাই মনু বিধি হরি হর কো॥
সো মৈঁ কুমতি কহৌঁ কেহি ভাঁতী। বাজ সুরাগ কি গাঁডর তাঁতী॥

এইরকম অবস্থায় আমি যা কিছু লিখছি তাকে কেবল আমার নিজের চিত্তবিনোদনের জন্য বলে মনে করে নিতে হবে, ত্রুটির জন্য সহৃদয় পাঠকগণ মার্জনা করবেন।

প্রেমের তত্ত্ব খুবই রহস্যপূর্ণ। যিনি এই তত্ত্ব জানতে পেরেছেন তিনি তো প্রেমময় হয়ে গিয়েছেন। প্রেমের যথার্থ রহস্যকে একমাত্র পূর্ণ পুরুষোত্তম শ্রীবাসুদেবই সম্পূর্ণরূপে জানেন, তাঁর প্রেমী ভক্তরাও অল্পাধিক জানেন। এজন্য প্রেমের তত্ত্বকে জানেন এমন নিষ্কাম জ্ঞানী ভক্তদের ভগবান গীতায় নিজের মুখে স্বয়ং প্রশংসা করেছেন—

তেষাং জ্ঞানী নিত্যযুক্ত একভক্তির্বিশিষ্যতে।
প্রিয়ো হি জ্ঞানিনোঽত্যর্থমহং স চ মম প্রিয়ঃ॥

(গীতা ৭।১৭)

'সেই চার প্রকারের ভক্তদের মধ্যেও নিত্য একাত্মভাবে স্থিত অনন্য-প্রেম-ভক্তি-সম্পন্ন জ্ঞানী ভক্ত অতি উত্তম, কেননা আমাকে তত্ত্বগতভাবে জ্ঞাত জ্ঞানীদের কাছে আমি অত্যন্ত প্রিয় এবং তারাও আমার অত্যন্ত প্রিয়।'

বাস্তবে প্রেম ভগবানের সাক্ষাৎ রূপ। বিশুদ্ধ প্রকৃত প্রেম যিনি লাভ করেছেন তিনি ভগবানকে পেয়ে গিয়েছেন। ভগবান প্রেমময় এবং ভগবানই প্রেম করার যোগ্য। সেজন্য যাই হোক না কেন আমাদের উচিত ভগবানকে সর্বপ্রকারে অনন্য ও বিশুদ্ধ প্রেম করার চেষ্টা করা। এখানে প্রশ্ন হতে পারে যে ভগবান কেমন ? তাঁর স্বরূপ কেমন ? এবং তাঁকে কীভাবে প্রেম করা যায় ? এগুলির সংক্ষিপ্ত উত্তর এই মনে করা যেতে পারে যে সেই সর্বব্যাপক ভগবান অমৃতময়, সুখস্বরূপ এবং নিত্য, সত্য, বিজ্ঞান-

আনন্দময়। ভগবান নিজেই বলেছেন—

ব্রহ্মণো হি প্রতিষ্ঠাহমমৃতস্যাব্যয়স্য চ।
শাশ্বতস্য চ ধর্মস্য সুখস্যৈকান্তিকস্য চ॥

(গীতা ১৪।২৭)

'আমিই হলাম অবিনাশী পরমব্রহ্মের এবং অমৃতের তথা নিত্য (সনাতন) ধর্ম ও অখণ্ড একরস আনন্দের আশ্রয়। অর্থাৎ ব্রহ্ম, অমৃত, অব্যয়, শাশ্বত ধর্ম এবং ঐকান্তিক সুখ এই সবই আমার নাম।' এরূপ পরমাত্মা সকল ভূত-প্রাণীর হৃদয়ে আত্মরূপে নিবাস করেন। তিনি বলেন—

অহমাত্মা গুড়াকেশ সর্বভূতাশয়স্থিতঃ।
অহমাদিশ্চ মধ্যং চ ভূতানামন্ত এব চ॥

(গীতা ১০।২০)

'হে অর্জুন ! আমি সকল ভূত-প্রাণীর হৃদয়ে অবস্থিত সকলের আত্মা এবং সকল ভূতের আদি, মধ্য ও অন্তও আমি।' এইরূপে পরমাত্মার স্বরূপকে জেনে সর্বভূতস্থিত পরমাত্মার সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রেম করাকেই বলা হয় প্রেম। বিশ্বের সকল জীব হলো পরমাত্মার নিবাস স্থান। এই কথা বুঝে নিয়ে সকলের সঙ্গে বিশুদ্ধ প্রেম করার জন্য বিশেষ প্রয়াস করা উচিত। যে মানুষ এই ভগবৎ প্রেমকে ভালভাবে বুঝে নেয় তার সকল প্রাণীর সঙ্গে নিজের আত্মবৎ প্রেম হয়ে যায়। এমন প্রেমীর প্রশংসা করে ভগবান বলেছেন—

আত্মৌপম্যেন সর্বত্র সমং পশ্যতি যোঽর্জুন।
সুখং বা যদি বা দুঃখং স যোগী পরমো মতঃ॥

(গীতা ৬।৩২)

'হে অর্জুন ! যে যোগী আপন সাদৃশ্যের ন্যায় সকল ভূতকে সমরূপে দেখে এবং সুখ অথবা দুঃখকেও সকলের মধ্যে তুল্য দেখে সেই যোগীকে পরম শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয়।'

নিজের সাদৃশ্যের ন্যায় সমানরূপে দেখার অভিপ্রায় হলো এই যে, যেমন

মানুষ নিজের মস্তক, হস্ত, পদ এবং গুহ্যাদি অঙ্গের সঙ্গে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, শূদ্র ও ম্লেচ্ছদের মতো ভেদযুক্ত আচরণ করেও সকল অঙ্গের প্রতি সমান আত্মভাব রাখে অর্থাৎ সকল অঙ্গে নিজস্বতা সমান হওয়ায় সুখ এবং দুঃখকে সমানরূপে দেখে, তেমনই সকল ভূত-প্রাণীতে সমদৃষ্টি সম্পন্ন হওয়া উচিত। এইভাবে সমত্বভাব প্রাপ্ত ভক্তের হৃদয় প্রেমে সিক্ত হতে থাকে। সে কেবল প্রেমের দৃষ্টিতেই সব দিক অবলোকন করে, তার হৃদয়ে কারও প্রতি ঘৃণা এবং দ্বেষ বিন্দুমাত্র থাকে না। শ্রুতি বলেছে—

যস্তু সর্বাণি ভূতান্যাত্মন্যেবানুপশ্যতি।
সর্বভূতেষু চাত্মানং ততো ন বিজুগুপ্সতে॥

(ঈশোপনিষদ্ ৬)

'যে বিদ্বান সকল ভূতকে নিজের আত্মার দ্বারা ভেদরহিত দেখেন এবং নিজের আত্মাকে সকল ভূতের মধ্যে দেখেন তিনি কাউকেই নিন্দা করেন না।'

অন্য কেউ হলে তার নিন্দা করা যায়, তাঁর দৃষ্টিতে সমগ্র সংসার এক বাসুদেব রূপই হয়ে যায়। এই পরম তত্ত্বকে না জানার কারণেই অধিকাংশ মানুষই পরমাত্মাকে ছেড়ে দিয়ে সংসারের তুচ্ছ বিষয়ভোগের দিকে ধাবিত হয় এবং বারংবার দুঃখ পেতে থাকে। মানুষ যে স্ত্রী, পুত্র, অর্থ প্রভৃতি পদার্থে সুখ গণ্য করে তাদের প্রতি আসক্ত হয়, সেইসব আপাত রমণীয় বিষয়গুলিতে তাদের যে সুখের প্রতীতি হয় তা কেবল ভ্রমবশতই হয়ে থাকে, বাস্তবে বিষয়গুলিতে সুখ নেই। কিন্তু যেমন সূর্য কিরণে মরুভূমিতে মরীচিকা দেখা যায় আর তৃষ্ণার্ত হরিণ ভুল করে সেদিকে দৌড়ায় এবং শেষপর্যন্ত নিরাশ হয়ে মরে যায়, ঠিক তেমনই সাংসারিক মানুষ সংসারের বিষয়গুলিতে সুখের আশায় ছোটাছুটি করে জীবনের অমূল্য সময় ব্যর্থ অতিবাহিত করে আর প্রকৃত নিত্য পরমাত্ম-সুখে বঞ্চিত থেকে যায়।

মানুষের কাছে স্ত্রী-পুত্র-অর্থ প্রভৃতি পদার্থগুলি অপেক্ষা তার নিজের জীবন অধিক প্রিয়। কেননা জীবনকে রক্ষা করবার নিমিত্ত মানুষ সেগুলি

ত্যাগ করতে পারে। এই জীবন অপেক্ষাও আত্মা অধিকতর প্রিয়, কেননা আত্মার জন্য মানুষ জীবনত্যাগ করার ইচ্ছাও করতে পারে। বিশেষভাবে কষ্ট পেয়ে যখন জীবন দুঃখময় হয়ে যায় তখন মানুষ মূর্খের মতো আত্মহত্যা করার জন্য নানাপ্রকারে চেষ্টা করে এবং আত্মার প্রকৃততত্ত্ব না জানায় দুঃখ দূর করবার বাস্তবিক উপায় চিন্তা না করে আত্মসুখের ইচ্ছায় আত্মঘাত করে বসে এবং তার ফলস্বরূপ ঘোর নরকে পতিত হয়ে দুঃখ ভোগ করতে থাকে। মনুষ্য শরীর লাভ করে আত্মতত্ত্বকে না জেনে জীবন বাহিত করা একরকম আত্মঘাত। আত্মঘাতীর গতি বর্ণনা করে শ্রুতি বলেছেন—

অসূর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাঁস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

(ঈশোপনিষদ্ ৩)

'যেসব মানুষ আত্মার হননকারী, তারা মৃত্যুর পর ঘোর অন্ধকারে আচ্ছাদিত আসুরী যোনি প্রাপ্ত হয়।'

এই তত্ত্বকে বুঝে নিয়ে মানুষের এই অন্ধকারময় আত্মঘাতকতা থেকে বাঁচা উচিত এবং আত্মার উন্নতি ও মুক্তির জন্য সেই পরম পিতা পরমেশ্বরের প্রতি পরম প্রেম করা উচিত, যিনি সকলের আত্মা। পরমেশ্বরের প্রতি প্রেমই হলো বিশ্বের প্রতি প্রেম আর বিশ্বের সকলের প্রতি প্রেমই হলো ভগবানের প্রতি প্রেম। কেননা স্বয়ং পরমেশ্বরই সকলের আত্মারূপে বিরাজমান।

সকলের প্রতি প্রেম করবার সহজ উপায় হলো স্বার্থ ত্যাগ করে সেবা করা। 'স্বার্থ' শব্দে কেবল স্ত্রী-পুত্র-অর্থ প্রভৃতিকেই বোঝা উচিত নয়। মান, সম্মান, প্রতিষ্ঠা, কীর্তি, সুন্দর লোকপ্রাপ্তি প্রভৃতি সব কিছুই স্বার্থের অন্তর্গত। সেই প্রেমমূর্তি পরমাত্মাকে প্রেমের জন্যই সেবা ও প্রেম করা উচিত। যে ব্যক্তি পরমাত্মার সঙ্গে প্রেম করতে চেষ্টা করেন প্রেমস্বরূপ পরমাত্মা তাঁর অতি নিকটে থাকেন। বিশুদ্ধ প্রেমের মধ্যে আকর্ষণ করবার যত শক্তি আছে তত শক্তি চুম্বক প্রভৃতি কোনো বস্তুর নেই। চুম্বক প্রভৃতি বস্তু কেবল জড় পদার্থকেই আকর্ষণ করে, চেতনকে আকর্ষণ করতে পারে না।

কিন্তু এই প্রেম এমনই অনুপম যে সে সাক্ষাৎ চেতনস্বরূপ পরমেশ্বরকে আকর্ষণ করবার শক্তি রাখে। বন্ধুগণ ! ভগবান এক অমূল্য বস্তু। যদিও তাঁকে লাভ করবার প্রকৃত মূল্য কিছু হতেই পারে না তবু প্রেমী তাঁকে খুব সস্তাতেই পেয়ে যান। যখন মানুষ ভগবৎ-প্রেমে মত্ত হয়ে নিজেকে শ্রীভগবানের পবিত্র চরণে নিবেদিত করে দেয়, ভগবৎ-প্রেমের জন্য সহজেই পরম উৎসাহের সঙ্গে নিজের প্রাণকেও বিসর্জন দিতে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন ভগবান তার প্রেমের দ্বারা আকৃষ্ট হয়ে প্রকট হয়ে যান। প্রহ্লাদের কাছে স্তম্ভ থেকে এবং গোপীদের কাছে মুরলীবনে তাঁকে পাওয়ার কথা প্রসিদ্ধ। এইভাবে ভগবানকে পাওয়া কি খুব সস্তা নয় ? কোথায় আমরা আর কোথায় শুদ্ধ সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা ? তুচ্ছ প্রাণের বদলে যদি পরমাত্মাকে লাভ করা যায় তাহলে আর কী চাই ? কবি বলেছেন—

জো সির সাটে হরি মিলে, তো তেহি লীজৈ দৌর।
না জানোঁ যা দেরমেঁ, গাঁহক আবৈ ঔর॥
সির দিন্হে জো পাইয়ে, দেত ন কীজৈ কানি।
সির সাটে হরি মিলৈ তো, লীজৈ সস্তা জানি॥
সবৈ রসায়ন হম কিয়ে, হরি-রস সম নহিঁ কোয়।
রঞ্জক ঘটমেঁ সঞ্চরে, (তো) সব তন কঞ্চন হোয়॥

এই প্রভু, যিনি প্রেমকে জানেন তিনি কেবল প্রেমকেই দেখেন। যখন মানুষের প্রেম ভগবানের প্রতি নিজের আত্মার চেয়েও বেশি হয়ে যায়, যখন সে প্রাণের সঙ্গে নিজের সমগ্র আপনত্বকে, লোক-পরলোককে ভগবানে অর্পণ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন ভগবান তার সঙ্গে মিলিত না হয়ে থাকতে পারেন না। তবে প্রেম প্রকৃত হওয়া চাই। মিথ্যা প্রেমের দ্বারা কেউ তাঁকে ঠকাতে পারে না।

কৃষ্ণ কৃষ্ণ সব হী কহৈ, ঠগ ঠাকুর অরু চোর।
বিনা প্রেম রীঝেঁ নহীঁ, প্রেমী নন্দকিসোর॥

প্রকৃত প্রেমীর কাছে তিনি তো বিজিত হয়ে যান। প্রেমই হলো ভগবানের মূল্য। যে ব্যক্তি প্রেমের রহস্য জানেন তিনি ভগবানকে না পেয়ে কীকরে নিশ্চিন্ত থাকবেন ? কেননা তিনি ভগবান ব্যতিরেকে নিজের জীবনকে ব্যর্থ মনে করেন। তাই সামান্য জীবনের মূল্যের বিনিময়ে যখন ভগবানকে পাওয়া যাবেই তখন কেমন করে সে দেরী করবে ? ভগবানের মতো অমূল্য বস্তুকে এত কম দামে পাওয়া গেলে তা কীকরে ছাড়া যেতে পারে ? যারা ভগবানের এই প্রেম-তত্ত্বকে জানে না তারা মানুষের রূপবিশিষ্ট পশুর মতো। এই রকম পশুধর্মী মানুষ সংসারের সুখ-বিলাস এবং ভোগের জন্য জীবনধারণ করে মনুষ্যশরীরকে কলঙ্কিত করে এবং নিজের জীবন ব্যর্থ নষ্ট করে দেয়। যে ভাগ্যবান ভগবানের প্রেমে বিহ্বল হয়ে প্রাণত্যাগ করেন তাঁর প্রাণকে ত্যাগ করতে কোনো কষ্ট হয় না। তিনি প্রচুর প্রসন্নতা এবং অপার আনন্দের সঙ্গে প্রভুর চরণে নিজের শরীর অর্পণ করে দেন। সেই সময় তাঁর হৃদয়ে আনন্দের যে দিব্য সমুদ্র উত্থিত হয় তার অতল তলে সমস্ত পাপ-তাপ, দুঃখ-কষ্ট চিরকালের জন্য ডুবে যায়। হিরণ্যকশিপু প্রহ্লাদকে বার বার মৃত্যুর মুখে ফেলে দিয়ে অপার কষ্ট দিয়েছেন। কিন্তু সেগুলিতে তার কিছু মাত্র কষ্ট হয়নি। ভগবানের প্রতি প্রেমের কারণে সে পরম আনন্দে মগ্ন থেকে সর্বদাই নির্ভীক ছিল। তার সেই আনন্দ এবং ভয়শূন্য স্থিতির বর্ণনা করা অসম্ভব। প্রহ্লাদের স্থিতির খবর কেবল প্রহ্লাদেরই জানা আছে। প্রহ্লাদের জীবনী পাঠ করলে মানুষদের মধ্যেও যখন আনন্দ, নির্ভয়তা, ঈশ্বরে প্রেম এবং বিশ্বাস বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয় তখন স্বয়ং প্রহ্লাদের শ্রদ্ধা, প্রেম, শান্তি এবং নির্ভয়তা প্রভৃতি গুণের বর্ণনা কেউ কেমন করে করতে পারবে ?

ভগবানের প্রকৃত প্রেমী ভগবান ব্যতীত অন্য কিছুর চিন্তা করে না। ভগবানের চিন্তনও করা হয় শুধু ভগবানের প্রতি প্রেমের জন্যই। সে ভগবানের কাছে এবং ভগবানের প্রেমিক ভক্তের কাছে প্রেম ছাড়া আর কিছু চায় না। সে যখন কখনও কখনও ভগবানের প্রেমিক ভক্তের সঙ্গে মিলিত হয় তখন সে ভগবানের প্রেমে মগ্ন হয়ে যায় এবং ভগবৎ-প্রেমরস

পাওয়ার জন্য তাঁর কাছে সেইভাবেই যাঞ্চা করে যেমনভাবে মেঘকে দেখে জলবিন্দুর জন্য চাতক পাখি শুধুমাত্র চাতক জলের জন্য সুমধুর স্বরে ডাকতে থাকে। ভগবৎ-প্রেমের পিপাসু সাধুও মহাত্মারূপী মেঘের কাছে স্বাতী-জলবিন্দুর জন্য সুমধুর স্বরে বিনতি করে। চাতক পাখির তো এটি স্থির নিয়ম যে মেঘের জল ছাড়া মাটিতে পড়া অন্য কোনো জল, এমনকি পবিত্র গঙ্গাজলও পান করে না, তুলসীদাস বলেছেন—

তুলসী চাতক দেত সিখ, সুতহিঁ বারহী বার।
তাত ত তর্পন কীজিয়ো, বিনা বারিধর-ধার॥
জিয়ত ন নাঈ নারি, চাতক ঘন তজি দূসরহিঁ।
সুরসরিহূকো বারি, মরত ন মাঁগেউ অরঘ জল॥
সুনি রে তুলসীদাস, প্যাস পপীহহিঁ প্রেমকী।
পরিহরি চারিউ মাস, জো অঁচবৈ জল স্বাতিকী॥

—ভগবৎ-প্রেমিক পুরুষও অনুরূপভাবে প্রেম ছাড়া তুচ্ছ সাংসারিক বস্তুর ভোগ কখনও ইচ্ছা করেন না। এইটিই তাঁর দৃঢ় সিদ্ধান্ত, তাঁর সহজ স্বভাব।

সর্বত্র ভগবানের স্বরূপ চিন্তনকারী ব্যক্তির ভগবানের প্রতি এত গভীর প্রেম হয়ে যায় যে তিনি মুহূর্তের জন্যও ভগবৎ-চিন্তাকে ভুলতে পারেন না। যদি কোনো কারণে তাঁর ভগবৎ-চিন্তা ছিন্ন হয় তাহলে জল ছাড়া মীনের মতো তিনি ব্যাকুল হয়ে যান।

তদর্পিতাঽখিলাচারিতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতা।

(নারদ ভক্তিসূত্র ১৯)

দেবর্ষি নারদ একেই প্রেম-ভক্তি বলেছেন। ভগবৎ-প্রেমে মাতোয়ারা ব্যক্তি যখন প্রেমে মগ্ন হয়ে যান তখন তাঁর বিচিত্র অবস্থা হয়ে যায়। নিজের প্রেমাস্পদের নাম, গুণ এবং রূপের মহিমা শুনে প্রেম-বিহ্বলতার কারণে তিনি নিজের আত্মপরিচয় ভুলে যান।

প্রেম-পিয়ালা জিন্হ পিয়া, ঝুমত তিন্হকে নৈন।

নারায়ণ বে রূপ-মদ, ছকে রহেঁ দিন রৈন॥
প্রেম অধীন্যো ছাক্যো ডোলৈ, ক্যোঁকি ক্যোঁহী বাণী বোলৈ।
জৈসে গোপী ভুলী দেহা, তৈসো চাহে জাসোঁ নেহা॥

প্রীতি কী রীতি কছূ নহিঁ রাখত,
জাতি ন পাঁতি, নহীঁ কুলগারো।
প্রেমকো নেম কহূঁ নহিঁ দীসত,
লাজ ন কান লগ্যো সব খারো॥
লীন ভয়ো হরিসূঁ অভিঅন্তর,
আঠহুঁ জাম রহৈ মতবারো।
সুন্দর কোউক জানি সকৈ যহ,
গোকুল গাঁবকো পৈঁড়োহি ন্যারো॥

কথিত আছে যে, একবার এক প্রেমোন্মাদিনী গোপীর মনে এই শঙ্কা দেখা দিয়েছিল যে শ্রীকৃষ্ণের এত বেশি ধ্যান করার ফলে সে যদি নিজেই শ্রীকৃষ্ণ হয়ে যায়! কেননা 'ভ্রমর-কীট' ন্যায়ানুসারে ধ্যানরত ব্যক্তি ধ্যানের লক্ষ্যবস্তুতে পরিণত হয়ে যায়। সেইরকম সেও যদি শ্রীকৃষ্ণ হয়ে যায় তাহলে তার শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গে প্রেম-বিলাসের আনন্দ কেমন করে হবে? তখন অন্য এক গোপী তাকে বলেছিল 'এর জন্য তুই চিন্তা করিস না। শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে তুই যদি শ্রীকৃষ্ণ হয়ে যাস তাহলে শ্রীকৃষ্ণ তোকে ধ্যান করতে করতে গোপী হয়ে যাবে। প্রেমিক- প্রেমাস্পদের আনন্দ যেমনকার তেমনই থেকে যাবে। অতএব তুই শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানে মগ্ন থাক।'

প্রেম-দশার বর্ণনা কেমন করে করা যাবে? প্রেমিক তার প্রেমাস্পদের নাম, গুণ এবং রূপের সঙ্কেতমাত্রে এতই বিহ্বল হয়ে যায় যে তার বর্ণনা করা যায় না। শ্যামবর্ণে রঞ্জিতা গোপীরা কাক, কোকিল, কাজল, কয়লা প্রভৃতি কালো রঙের কোন বস্তু দেখলেই অথবা শ্রীকৃষ্ণের নামের মতো কোন নাম শুনলেই শ্রীকৃষ্ণের প্রেমে ভীষণ বিহ্বল হয়ে যেত। প্রেমরসে পরিপ্লাত শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু পুরীর সমুদ্রের শ্যামলিমাকে দেখে

তাকে শ্যামসুন্দর মনে করে পাগল হয়ে গিয়েছিলেন এবং দেহ, মনের জ্ঞান হারিয়ে তাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলেন। তল্লীনতাতে এমন স্থিতিই হয়ে থাকে।

ভয়বুদ্ধির দ্বারা ভজনকারী মারীচ বলেছিল যে রামকে তার এত ভয় যে, যে শব্দের প্রথমে 'র' আছে সেই শব্দ শোনা মাত্র রামকে তার সামনে দণ্ডায়মান দেখতে পায়।

রামমেব সততং বিভাবয়ে, ভীতভীত ইব ভোগরাশিতঃ।
রাজরত্নরমণীরথাদিকং, শ্রোত্রয়োর্যদি গতং ভয়ং ভবেৎ॥

(অধ্যাত্মরামায়ণ ৩।৬।২২)

'রাজত্ব, রত্ন, নারী, রথাদি শব্দ আমার কানে প্রবেশ করলে আমার ভয় করে। তাই ভোগরাশিতে ভয়ভীত আমি সর্বদা রামের চিন্তা করি।'

রাম আগত ইহেতি শঙ্কয়া, বাহ্যকার্যমপি সর্বমত্যজম্।
নিদ্রয়া পরিবৃতো যদা স্বপে, রামমেব মনসাঽনুচিন্তয়ন্॥

(অধ্যাত্মরামায়ণ ৩।৬।২৩)

'রাম এখানে এসে গিয়েছেন—এই আশঙ্কায় আমি বাইরের কার্যসমূহ ছেড়ে দিই। যখন আমি নিদ্রাভিভূত থাকি তখনও আমি রামের চিন্তা করি।'

স্বপ্নদৃষ্টিগতরাঘবং তদা, বোধিতো বিগতনিদ্র আস্থিতঃ।
তদ্ভবানপি বিমুচ্য চাগ্রহং, রাঘবং প্রতি গৃহং প্রয়াহি ভোঃ॥

(অধ্যাত্মরামায়ণ ৩।৬।২৪)

'আমি যখন স্বপ্নে রাঘবকে দেখি তখন জেগে উঠে নিদ্রারহিত হয়ে যাই। সেজন্য হে রাবণ ! আপনিও রাঘবের প্রতি (আমাকে পাঠানোর) আগ্রহ ত্যাগ করে ঘরে চলে যান।'

যখন ভয়ের কারণে এমন দশা হতে পারে তখন বিশুদ্ধ প্রেমের প্রেরণায় প্রেমাস্পদের প্রতি সেই রকম দশা হয়ে যাওয়ায় আশ্চর্যের কী আছে ? অবশ্য প্রেমের পথ খুবই গহন—খুবই দুর্গম, তীক্ষ্ণ তরবারির ধারের মতো। কেবল কথার দ্বারা তার প্রাপ্তি হয় না। বাইরের পোষাক অথবা চিহ্ন প্রেমের

পরিচয় নয়।

প্রেম প্রেম সব কোই কহে, প্রেম ন চীন্হে কোয়।
জেহি প্রেমহিঁ সাহিব মিলে, প্রেম কহাবে' সোয়॥

সেইটিই প্রকৃত প্রেম যার দ্বারা প্রভু শ্রীরামের সঙ্গে মিলন হয়। প্রেমপূর্ণ বিরহের ব্যাকুলতায়, করুণাপূর্ণ হৃদয়ের প্রকৃত আন্তরিক আহ্বানে, সত্যকার শ্রদ্ধা ও ভক্তিতে এবং হৃদয়ের একান্ত আগ্রহে শ্রীরামকে পাওয়া সম্ভব। এই সবগুলিই হলো প্রেমের পর্যায়। মিলনের একান্ত ইচ্ছা হলে ভগবানের বিরহে ব্যাকুল প্রেমিক যখন তার প্রেমাস্পদ ভগবানের সঙ্গে মিলনের সম্ভাবনার কথা জানতে পারে তখন খুবই মধুর অবস্থার সৃষ্টি হয়। গোস্বামী তুলসীদাস রামায়ণে সুতীক্ষ্ণের প্রেমের মহিমা জানাতে গিয়ে বলেছেন—

পন্নগারি সুনু প্রেম সম ভজন ন দূসর আন।
যহ বিচারি মুনি পুনি পুনি করত রাম গুন গান॥
হোইহেঁ সুফল আজু মম লোচন। দেখি বদন পঙ্কজ ভব মোচন॥
নির্ভর প্রেম মগন মুনি গ্যানী। কহি ন জাই সো দসা ভবানী॥
দিসি অরু বিদিসি পন্থ নহিঁ সূঝা। কো মৈঁ চলেউঁ কহাঁ নহিঁ বূঝা॥
কবহুঁক ফিরি পাছেঁ পুনি জাঈ। কবহুঁক নৃত্য করই গুন গাঈ॥
অবিরল প্রেম ভগতি মুনি পাঈ। প্রভু দেখৈঁ তরু ওট লুকাঈ॥

আহা! কী অপূর্ব আনন্দের দৃশ্য!

প্রেমিক যখন তার প্রেমাস্পদের বিরহে ব্যাকুল হয়ে যায় এবং তার সঙ্গে মিলনের উৎকণ্ঠায় তার জন্য প্রতীক্ষা করতে থাকে তখন প্রতি মুহূর্তে সে প্রেমাস্পদের পায়ের ধ্বনি শুনতে পায়। যে কেউ এলেই তার মনে হয় যে তার প্রেমাস্পদই আসছে। গোপীদের কাছে যখন উদ্ধব এসেছিল তখন তাদের মনে হয়েছিল যে প্রিয় শ্রীকৃষ্ণই উপস্থিত হয়েছেন। অনেক কাছে আসার পর তারা বুঝতে পারে যে সে শ্রীকৃষ্ণ নয়, সে হলো উদ্ধব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণ না হলে কী হবে, সে তো প্রাণপ্রিয় শ্রীকৃষ্ণের খবর নিয়ে এসেছে।

এজন্য সেও শ্রীকৃষ্ণের মতোই প্রিয়। ভাগবতের দশম স্কন্ধে সেই সময় গোপিকাদের বিচিত্র দশার খুবই মনোরম বর্ণনা আছে।

শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তমা রুক্মিণীর ভগবানের বিরহে যেরকম অবস্থা হয়েছিল, ভগবানের আসতে দেরী হওয়ায় তাঁর যে করুণ অবস্থা হয়েছিল তা খুবই রোমাঞ্চকর। প্রেমিকদের এই প্রসঙ্গটি শ্রীমদ্ভাগবতে দেখা উচিত।

ভরতের বিরহাবস্থা রামায়ণের পাঠকদের কাছে গোপন নেই। যখন হনুমান প্রভু শ্রীরামের খবর নিয়ে এসেছিল তখন ভরতের বিস্ময়কর অবস্থা দেখে সে প্রেমে তদ্‌গত হয়ে গিয়েছিল। সেখানকার বর্ণনা পড়ুন—

কো তুম্হ তাত কহাঁ তে আএ। মোহি পরম প্রিয় বচন সুনাএ।
দীনবন্ধু রঘুপতি কর কিংকর। সুনত ভরত ভেঁটেউ উঠি সাদর।
মিলত প্রেম নহিঁ হৃদয়ঁ সমাতা। নয়ন স্রবত জল পুলকিত গাতা॥
কপি তব দরস সকল দুখ বীতে। মিলে আজু মোহি রাম পিরীতে॥
এহিঁ সন্দেস সরিস জগ মাহীঁ। করি বিচার দেখেউঁ কছু নাহীঁ॥
নাহিন তাত উরিন মৈঁ তোহী। অব প্রভু চরিত সুনাবহু মোহী॥
নিজ দাস জ্যোঁ রঘুবংসভূষন কবহুঁ মম সুমিরন কর্‌য়ো।
সুনি ভরত বচন বিনীত অতি কপি পুলকি তন চরনন্হি পর্‌য়ো॥

রঘুবীর নিজ মুখ জাসু গুন গন কহত অগ জগ নাথ জো।
কাহে ন হোই বিনীত পরম পুনীত সদগুন সিন্ধু সো॥
রাম প্রান প্রিয় নাথ তুম্হ সত্য বচন মম তাত।
পুনি পুনি মিলত ভরত সুনি হরষ ন হৃদয়ঁ সমাত॥

নিজের প্রেমাস্পদের প্রেরিত বার্তা পেলে অথবা প্রেমিকের কোনো সমাচার পেলে যখন গোপী, রুক্মিনী এবং ভরতের মতো অবস্থা হতে থাকে তখনই বুঝতে হবে যে প্রকৃত বিরহ সৃষ্টি হয়েছে।

আহা! কৃষ্ণপ্রাণ মীরার অবস্থা দেখুন। শ্রীকৃষ্ণ নামে রত হরির প্রেম-সাগরে নিমজ্জিত সেই মাতোয়ারা প্রেমার্তি গান করে—

নাতো নামকো জী ম্হাঁসূঁ, তনক ন তোড়্‌য়ো জায়॥

পানা জ্যুঁ পীলী পড়ী রে, লোগ কহে পিণ্ড রোগ।
ছানে লাঁঘণ মৈঁ কিয়া রে, রাম মিলণকে জোগ॥
বাবল বৈদ বুলাইয়া রে, পকড় দিখাঈ ম্হারী বাঁহ।
মূরখ বৈদ মরম নহিঁ জাণৈ, কসক কলেজে মাঁহ॥
জাওো বৈদ ঘর আপণে রে, ম্হারো নাম ন লেয়।
মৈঁ তো দাঝী বিরহকী রে, কাহে কূঁ ঔষধ দেয়॥
মাঁস গল গল ছীজিয়ো রে, করক রহ্যা গল আয়।
আঁগলিয়াঁরী মূঁদড়ী ম্হারে, আবণ লাগী বাঁহ॥
রহ রহ পাপী পপীহরা রে, পিবকো নাম ন লেয়।
জে কোঈ বিরহণ সাঁভলে তো, পিব কারণ জিব দেয়॥
ছিন মন্দির ছিন আঁগণে রে, ছিন ছিন ঠাঢ়ী হোয়।
ঘায়ল-সী ঝুমূঁ খড়ী ম্হারী, ব্যথা ন বূঝে কোয়॥
কাঢ় কলেজো মৈঁ ধরূঁ রে, কৌআ তূ লে জায়।
জ্যাঁ দেশাঁ ম্হারো হরি বসৈ রে, বাঁ দেখত তূ খায়॥
ম্হারে নাতো রামকো রে, ঔর ন নাতো কোয়।
মীরা ব্যাকুল বিরহণী রে, (হরি) দর্শন দীজ্যো মোয়॥

এই বিশুদ্ধ প্রেমই হলো পরমাত্মার মূল্য অথবা মনে করুন এটিই হলো পরমাত্মার স্বরূপ। এই বিশুদ্ধ প্রেমের যতই বৃদ্ধি হয় মানুষ পরমাত্মার ততই কাছে পৌঁছায়। সূর্য যেমন অলোর পুঞ্জ, পরমেশ্বরও তেমনই প্রেমের পুঞ্জ। মানুষ যতই সূর্যের কাছাকাছি যায় ততই আলোর বৃদ্ধি হতে থাকে। তেমনই সে প্রেমময় ভগবানের যত কাছে যায় ততই তার প্রেম বৃদ্ধি পেতে থাকে। অথবা এই কথা মনে করুন যে প্রেম যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ততই মানুষ পরমাত্মার নিকটবর্তী হয়। যেমন সূর্য এবং আলো দুটি ভিন্ন বস্তু নয়, আলো হলো সূর্যের স্বরূপ তেমনই প্রেম এবং ভগবান স্বতন্ত্র নয়। প্রেম হলো ভগবানের সাক্ষাৎ স্বরূপ।

মানুষ যখন ভগবৎ-প্রেমের রঙে রঞ্জিত হয়ে যায় তখন সে প্রেমময় হয়ে

যায়, সেই সময় প্রেম (ভক্তি), প্রেমিক (ভক্ত) এবং প্রেমাস্পদ ভগবান তিনজনই একটি রূপেই পরিণত হয়ে একটি বস্তুই হয়ে যায়। প্রেমিক, প্রেম এবং প্রেমাস্পদ বলার জন্য তিনটি কিন্তু বাস্তবে তারা একটিই, তিনটি রূপে প্রকট হচ্ছে। ভগবানের জ্ঞানী, প্রেমিক ভক্ত এমনই বলে থাকেন। যখন মানুষ ভগবান বাসুদেবের প্রেমে আত্যন্তিকরূপে নিমগ্ন হয়ে যায় তখন সে সর্বদা সর্বতোভাবে এবং সর্বত্র প্রতি পদে ভগবানকেই দেখতে পায়। ভগবান গীতায় বলেছেন—

বহূনাং জন্মনামন্তে জ্ঞানবান্মাং প্রপদ্যতে।
বাসুদেবঃ সর্বমিতি স মহাত্মা সুদুর্লভঃ॥ (৭।১৯)

'অনেক জন্ম-জন্মান্তরের শেষে তত্ত্বজ্ঞানলব্ধ জ্ঞানী সবকিছুই বাসুদেব অর্থাৎ বাসুদেব ছাড়া অন্য কিছুই নেই, এইভাবে আমাকে ভজনা করে। এরকম মহাত্মা দুর্লভ।' এইটিই প্রেমের প্রকৃত স্বরূপ।

—— ০ ——

ভগবানের দয়া

কয়েকজন বন্ধু আমাকে ঈশ্বরের সদ্‌গুণ সম্পর্কে লিখতে বলেছেন। কিন্তু আমি এই বিষয়ে নিজেকে অক্ষম বলে মনে করি। কেননা ঈশ্বরের সদ্‌গুণ অপার। সংসারে যত উত্তম গুণ দেখতে, শুনতে এবং পাঠ করা যায় তা সবই পরিমিত, সসীম এবং সেই অপ্রমেয়, অসীম পরমাত্মার এক অংশের দ্বারাই সেগুলি প্রকাশিত। **'একাংশেন স্থিতো জগৎ'** (গীতা ১০।৪২)। পরমাত্মার গুণগুলির সম্যকরূপে বর্ণনা কেউই করতে পারে না, বেদশাস্ত্রে যা কিছু বলা হয়েছে তা খুবই সামান্য। অন্য গুণগুলির কথা তো স্বতন্ত্র, সেই দয়াময়ের শুধুমাত্র দয়ার দিকে যদি দৃষ্টি দেওয়া হয় তো মুগ্ধ হতে হয়। আহা ! সেই অসীম দয়ার তল কে পেতে পারে ? যখন শুধুমাত্র দয়ারই বর্ণনা করা মানুষের সামর্থ্যের বাইরে তখন সকল গুণের

বর্ণনা করা তো একেবারেই অসম্ভব। লোকেরা তাঁকে দয়াসিন্ধু বলে। বেদশাস্ত্রও তাঁকে দয়ার সমুদ্র বলে জানিয়েছে। কিন্তু চিন্তা করলে বোঝা যায় যে এই উপমাও সমীচিন নয়, এটি তো তাঁর অপরিমিত দয়ার একাংশেরই পরিচয়। কেননা সমুদ্র পরিমিত এবং সকল দিক থেকে সীমাবদ্ধ। কিন্তু অপরিমেয় পরমাত্মার দয়া তো অপার। তার সঙ্গে অনন্ত সমুদ্রেরও তুলনা করা যায় না। অবশ্য যাঁরা তাঁকে দয়াসিন্ধু এবং দয়ার সাগর বলে আমি তাঁদের নিন্দা করছি না। তার কারণ, জগতে সর্বাপেক্ষা বিশাল যা কিছু প্রত্যক্ষ করা হয়, মহত্ত্ব জানাতে তার সঙ্গে তুলনা করে লোকেদের বোঝান হয়।

যেখানে মন ও বুদ্ধি পৌঁছাতে পারে না সেখানে কথার দ্বারা তার বর্ণনা কীকরে হতে পারে ? তথাপি কোনো কিছুর বর্ণনা তো কেবল কথা দ্বারাই হতে পারে, তা যত বেশিই হোক না কেন ? সেজন্য কথার মাধ্যমে ভগবানের দয়ার যেসব বর্ণনা করা হয়েছে তা পর্যাপ্ত নয়, ঈশ্বরের দয়া তার চেয়ে অনেক বেশী। সকল জীবের প্রতি পরমাত্মার দয়া এত বেশি যে, যে ব্যক্তি সেই তত্ত্বকে বুঝতে পারে সে নির্ভয় হয়ে যায়, শোক-মোহ অতিক্রম করে যায়, অপার শান্তি লাভ করে এবং সে স্বয়ং দয়াময় হয়ে যায়। এইরকম মানুষের সকল কাজ দয়ায় পরিপূর্ণ থাকে। তার দ্বারা কারও প্রতি হিংসা হতেই পারে না।

দয়াময় পরমাত্মার সকল জীবের প্রতি এত দয়া যে সেই দয়াকে মানুষ সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারে না। নিজের বোধ অনুযায়ী সে অধিকতম যা বুঝতে পারে তাও নিতান্ত স্বল্প। মানুষ ঈশ্বরের দয়ার যথার্থ কল্পনাও করতে পারে না। ভগবানের সেই অনন্ত দয়া গঙ্গার প্রবাহের মতো সকলের প্রতি চারদিক থেকে সমানভাবে বাহিত হচ্ছে। এই দয়া থেকে মানুষ যত লাভ তুলতে চায় তা তুলতে পারে। দুঃখের কথা হলো যে লোকেরা এই রহস্যকে না জানার কারণে দুঃখী হচ্ছে। এ হলো তাদের মূর্খতা। এই সব লোকেদের অবস্থা সেই মূর্খ পিপাসার্ত মানুষের মতো, যে নিত্য-নিরন্তর

শীতল সুমধুর জল প্রবাহিনী গঙ্গার তীরে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু জ্ঞান না থাকায় সেই জলে তৃষ্ণা নিবারণ না করে ছটফট করছে।

ঈশ্বরের দয়া অপার। কিন্তু যে যতটা মানে সে সেই পরিমাণ ফলই পায়। এজন্য ঈশ্বরের যত বেশি দয়া তুমি নিজের উপর উপলব্ধি করতে পার ততোটাই করা উচিত। তোমার কল্পনা যত বেশি হবে ততই তোমার লাভ। যদিও ভগবানের দয়ার পার মানুষ দেখতে পায় না যেমন বিমানে উপবিষ্ট মানুষ আকাশে ওড়ার সময় আকাশের পার খুঁজে পায় না। তবু এই দয়ার সামান্য রহস্য জানতে পারলেও মানুষ কৃতকৃত্য হয়ে যায়। যেমন গঙ্গার অপরিমিত জল প্রবাহের এক ঘটি জলই মানুষের তৃষ্ণা নিবারণের পক্ষে যথেষ্ট। তেমনই এই অপার অপরিমিত দয়ার এক কণার দ্বারাই মানুষের অনন্ত জন্মের শোকাগ্নি চিরদিনের জন্য নির্বাপিত হতে পারে। এই তুলনাও যথেষ্ট নয়। কেননা সাধারণ জলবুদ্ধিতে গঙ্গার এক ঘটি জল পানেও মানুষের তৃষ্ণা সাময়িকভাবে নিবারিত হয়, কিন্তু ঈশ্বরের দয়ার কণামাত্রে ভয়, শোক, দুঃখের নিবৃত্তি এবং শান্তি ও পরমানন্দের প্রাপ্তি চিরদিনের জন্য হয়ে যায়। অতএব সকলের উচিত পরমেশ্বরের শরণ নিয়ে তাঁর দয়ার অনুসন্ধান করা।

ভগবানের দয়া সম্পূর্ণরূপে সর্বদা এবং সর্বত্র পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। সুখ অথবা দুঃখ, জয় অথবা পরাজয় যা কিছু পাওয়া যায় তা ঈশ্বরের দয়ায় পূর্ণ এবং তা স্বয়ং ঈশ্বরের প্রণীত বিধান। তাঁরই দয়া এই রূপে প্রকট হয়েছে। মানুষ যখন এই রহস্যকে বুঝতে পারে তখন সে যে আনন্দ, যে সুখ বিজয় প্রাপ্তিতে অনুভব করে সেই আনন্দই সে দুঃখ এবং পরাজয়ে অনুভব করে। যতক্ষণ পর্যন্ত ঈশ্বরের বিধানে সন্তোষ লাভ হয় না এবং সাংসারিক সুখ-দুঃখাদিতে আনন্দ ও শোক হয় ততক্ষণ মানুষ ভগবানের দয়ার তত্ত্ব বাস্তবে বোঝেনি। যখন ঈশ্বরকে কর্মানুসারে ফল প্রদানকারী, ন্যায়কর্তা, পরমপ্রেমী, পরম হিতৈষী, পরম দয়ালু এবং সুহৃদ বলে মনে করা হবে তখন তাঁর কৃত সকল বিধানের মধ্যে আনন্দের সীমা থাকবে না। বিষয়ী

এবং পামর ব্যক্তির হৃদয়ে তো স্ত্রী-পুত্র, ধন-সম্পত্তি প্রাপ্তিতে সাময়িক আনন্দ হয়। কিন্তু দয়ার তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তি ভগবানের দয়ার প্রভাব যতই বুঝতে পারবেন ততই তাঁর সন্তানের জন্ম ও মৃত্যু, অর্থ লাভ ও ক্ষতি, শরীরের সুস্থতা ও অসুস্থতা তথা অন্যান্য সমস্ত বস্তুর প্রাপ্তি ও বিনাশে নিত্য, নিরন্তর উত্তরোত্তর অধিকাধিক আনন্দ, শান্তি এবং সমতা বৃদ্ধি পেতে থাকবে।

যে মানুষ ভগবানের দয়ার যথার্থ প্রভাব জানতে পারেন তাঁর উদ্ধারের কথা আর কী বলব ! তিনি অপরের কাছেও মুক্তিদাতা হয়ে যান। তার কারণ ভগবৎ কৃপা এমনই বস্তু। সেই ভগবৎকৃপা মূককে বাচাল করে দেয় এবং পঙ্গুকে পর্বত লঙ্ঘনের শক্তি দান করে। লৌকিক দৃষ্টিতে অসম্ভব কর্ম সেই দয়ার দ্বারা সাধিত হয়। পরমাত্মা সর্বকর্মক্ষম, তাঁর কাছে কোনো কাজই অসাধ্য নয়। জীব সকল প্রকারে অক্ষম, কিন্তু পরমেশ্বরের দয়া এবং আদেশে তারাও সব কাজ করতে পারে। মশাও ব্রহ্মা হতে পারে। এখন এই প্রশ্ন হতে পারে যে যখন ভগবানের দয়া সকল জীবের প্রতি সর্বদা অপার এবং সমান তখন তাদের এত দুর্দশা হচ্ছে কেন ? এর উত্তর হলো যে লোকেরা ভগবানের দয়ার প্রভাব জানে না। কোনো দরিদ্রের ঘরে পরশ পাথর আছে, কিন্তু সে সম্পর্কে তার কোনো জ্ঞান নেই। সেজন্য সে যেমন দারিদ্র্যের দুঃখে পীড়িত হয়ে দীনতার সঙ্গে ভিক্ষা করতে থাকে তেমনই দয়ার তত্ত্বকে না জানার কারণে সকল জীব দুঃখী হয়ে আছে । অতএব লোকেদের উচিত দয়ার তত্ত্বকে জানবার জন্য তৎপর হয়ে চেষ্টা করা। পরমাত্মার দয়াকে জানবার জন্য মানুষের উচিত পরমাত্মার কাছে প্রতিদিন গদ্‌গদ হয়ে সবিনয়ে প্রার্থনা করা। প্রার্থনার দ্বারা, ভজন-পূজনের দ্বারা, তাঁর দয়ার যৎকিঞ্চিত প্রভাব সম্পর্কে অভিহিত মানুষদের সাহচর্য দ্বারা, সৎ শাস্ত্র আলোচনা দ্বারা এবং পরমেশ্বরের কৃত সকল বিধানে দয়ার অনুসন্ধান করার দ্বারা মানুষ পরমাত্মার দয়ার তত্ত্বকে জানতে পারে।

যদিও ভগবানের দয়ার তত্ত্ব সম্বন্ধে অবহিত মহাত্মাদের দেখা পাওয়া খুবই কঠিন তবু তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। যে মহাত্মাগণ দয়ার মহত্ত্বকে

কিছুটা জানেন তাঁরাও তা কথার দ্বারা বর্ণনা করতে পারেন না। কেননা ভগবানের দয়া এত বেশি যে সমস্ত দয়াকে একত্র করলে তা দয়ার সাগরের কণামাত্রের সমান নয়।

যার কাছে পরশ পাথর আছে তার দারিদ্র্য যেমন পরশ পাথরের প্রভাব বুঝতে পারা মাত্রই দূর হয়ে যায় তেমনই ভগবানের দয়ার প্রভাব বুঝতে পারলে মানুষের সকল প্রকারের দুঃখ সম্পূর্ণরূপে দূর হয়ে যায়। যে মানুষ ভগবানের দয়ার প্রভাব জেনে যায় সে প্রতিপদে সেই দয়ালুকে স্মরণ করে সর্বদা আনন্দে ডুবে থাকে। নিজের এরকম প্রিয়তম সুহৃদকে কেউ কীকরে ভুলতে পারে ? সে যা কিছু কাজ করে তা সবই সেই পরম দয়ালু পরমেশ্বরের আদেশেই করে। তার কোন কাজই পরমেশ্বরের ইচ্ছার প্রতিকূল হতে পারে না। যখন সাধারণ সৎ ব্যক্তিও তাঁর উপকারী এবং দয়ালুকে ভুলতে পারে না এবং তাঁর বিপরীত কাজ করতে পারে না তখন যিনি পরমাত্মার দয়ার প্রভাবকে জানেন সেই মহাত্মা পরমাত্মাকে কী করে ভুলতে পারেন এবং তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কোনো কাজ করতে পারেন ? এই রকম মানুষের আচরণকে 'সদাচার' বলা হয় এবং লোকেরা তাকেই প্রামাণিক মনে করে সেই অনুসারে চলে।

যদ্যদাচরতি শ্রেষ্ঠস্তত্তদেবেতরো জনঃ।
স যৎ প্রমাণং কুরুতে লোকস্তদনুবর্ততে॥

(গীতা ৩।২১)

এখন বুঝতে হবে যে দয়া কাকে বলে। 'কোনো দুঃখী, আর্ত প্রাণীদের দেখে তার দুঃখ এবং আর্তি ভাব দূর করবার জন্য অন্তঃকরণে যে দ্রবণীয় ভাব উৎপন্ন হয় তারই নাম দয়া।' পরমেশ্বরের এই দয়া সকল জীবের প্রতি সমানভাবে সদা-সর্বদা বিদ্যমান। জীব পরমেশ্বরের প্রতিকূল যত আচরণই করুক না কেন পরমেশ্বর সব সময় তার প্রতি দয়ার দৃষ্টিতেই দেখেন। সংসারে এর উপযুক্ত কোনো দৃষ্টান্ত দেখা যায় না। মায়ের দৃষ্টান্ত দেওয়া হয়ে থাকে, তা কিছু অংশে ঠিক। ছেলে যদি কুপাত্র এবং অধোগামী হয়,

সবসময় মাকে জ্বালাতন করে, গালাগালি করে তাহলেও মা ছেলের মঙ্গল কামন করেন, কখনও তার ক্ষতি বা বিনাশ চান না। এটি হলো তাঁর দয়া। কিন্তু ভগবানের দয়া বোঝার পক্ষে এই দৃষ্টান্ত সম্পূর্ণরূপে ঠিক নয়। এমনও দেখা যায় যে যথেষ্ট বিরক্ত করার ফলে মা দুঃখ সহ্য করতে না পেরে স্বার্থের বশবর্তী হয়ে ছেলেকে ত্যাগ করতে পারেন, কখনও কখনও তার অনিষ্ট চাইতে পারেন। কিন্তু কেউ পরম পিতা পরমেশ্বরের যতই বিরুদ্ধাচরণ করুক না কেন, তিনি তাকে ত্যাগ করেন না এবং তাঁর অনিষ্টও চান না। এটি হলো তাঁর পরম দয়ার নিদর্শন। বিপরীত আচরণকারীকে ভগবান যে শাস্তি দেন তাও তাঁর পরম দয়া। ছাত্র অনুচিত আচরণ করলে গুরু যখন তার ভালর জন্য এবং তাকে দুরাচার থেকে নিবৃত্ত করার জন্য শাস্তি দেন অথবা যে প্রজা চুরি করে কিংবা ডাকাতি করে তাকে রাজা উচিত শাস্তি দেন তখন যেমন গুরুর এবং রাজার আচরণ তার প্রতি দয়া বলে মনে করা হয়, তেমনই পরমাত্মারূপ গুরুর দণ্ডবিধানকে পরম দয়া বলেই মনে করা উচিত। এই দৃষ্টান্তও পর্যাপ্ত নয়। গুরু এবং রাজার ভুল হতে পারে, কোনো অন্য কারণেও তাঁরা ভুল করে শাস্তি দিতে পারেন। কিন্তু ঈশ্বরের দণ্ডবিধান কেবল দয়ার জন্যই হয়ে থাকে। আমরা যখন পরমাত্মার দয়া নিয়ে চিন্তা করি তখন প্রতিপদে তাঁর দয়ার পরিচয় পাই। সর্বপ্রথম পরমেশ্বরের নিয়মগুলির দিকে দেখুন, সেগুলি কতই না দয়াপূর্ণ। কোনো প্রাণী যত পাপীই হোক না কেন, অনেক তীর্যক যোনি ভোগের পর তাকে পরমাত্মা মনুষ্য শরীর দিয়ে থাকেন। যদি তার পাপের দিকে মন দেওয়া হয় তাহলে দেখা যায় যে তার মনুষ্য শরীর লাভের সম্ভাবনাই নেই। কিন্তু পরমেশ্বরের অহেতুক পরম দয়ার ফল হলো যে আবার মনুষ্য শরীর দিয়ে তাকে সংশোধনের সুযোগ করে দেওয়া।

তুলসীদাস বলেন—

আকর চারি লচ্ছ চৌরাসী। জোনি ভ্রমত যহ জিব অবিনাসী॥
কবহুঁক করি করুনা নর দেহী। দেত ঈস বিনু হেতু সনেহী॥

দ্বিতীয় বিধান হলো, কেউ যত পাপীই হোক না কেন যখন সে ভগবানের শরণাগত হয়, অর্থাৎ সকল পাপকে ত্যাগ করে ভগবানের অনুকূল হয়ে যায় তখন ভগবান তার পুরাতন পাপ নষ্ট করে দিয়ে তাকে তখনই মুক্তিপদ প্রদান করেন। ভগবান শ্রীরাম বলেছেন—

সকৃদেব প্রপন্নায় তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্বভূতেভ্যো দদাম্যেতদ্‌ব্রতং মম॥

(বাল্মিকীরামায়ণ ৬।১৮।৩৩)

তৃতীয় বিধান হলো, অতি সাধারণ মানুষও যদি প্রেমের সঙ্গে পরমাত্মার ভজনা করে তাহলে ভগবানও তাকে সেইভাবে ভজনা করেন। 'যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।' (গীতা ৪।১১)। শুধু তাই নয়, পরমেশ্বরের ভজনার প্রতাপে তার পূর্বকৃত পাপ দূর হয়ে যায় এবং সেও তাড়াতাড়ি পরম ধর্মাত্মা হয়ে দুর্লভ পরম গতি লাভ করে। ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কথা হলো—

অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্।
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ব্যবসিতো হি সঃ॥
ক্ষিপ্রং ভবতি ধর্মাত্মা শশ্বচ্ছান্তিং নিগচ্ছতি।
কৌন্তেয় প্রতি জানীহি ন মে ভক্তঃ প্রণশ্যতি॥

(গীতা ৯।৩০-৩১)

যে পরমেশ্বরকে ভক্তি করে পরমেশ্বর সর্বপ্রকারে তাকে রক্ষা করেন এবং তাকে সাহায্য করেন এবং উপযুক্ত বুদ্ধিপ্রদান করে তাকে এই অসার সংসার থেকে উদ্ধার করে দেন।

আপনারা ভেবে দেখুন যে এই বিধানগুলির মধ্যে পরমাত্মার কত দয়া নিহিত। তাই নয়, ভগবানের সকল বিধান এই রকমই দয়াপূর্ণ। লেখাটি খুব বিস্তারিত হয়ে যাবে বলে সবকথা এখানে লেখা সম্ভব হল না। এরূপ দয়াপূর্ণ বিধান সংসারে মা, বাবা, গুরু, রাজা প্রভৃতি কারো কাছে নেই।

এখন অন্য দিকে মন দিন, ঈশ্বর আমাদের সুবিধার জন্য পৃথিবীতে মাটি,

জল, আগুন, বায়ু, আকাশ, সূর্য, চাঁদ প্রভৃতি অদ্ভুত জিনিস সৃষ্টি করেছেন যেগুলির দ্বারা আমরা আরামে জীবনযাপন করি এবং সুখে থাকি। এইসব জিনিসের সুফল সকলে বিনামূল্যে, কোনোরকম বাধা ছাড়াই পূর্ণ মাত্রায় সমান ভাবে সহজেই পেয়ে যায়। গুরুতর পাপীও ভগবানের এই দান থেকে বঞ্চিত হয় না।

ঈশ্বর সংসারের বস্তুগুলিও এমনভাবে সৃষ্টি করেছেন যে সেগুলি সম্পর্কে চিন্তা করলে খুবই উপদেশ পাওয়া যায়। আমরা যে কোনো বস্তুর দিকেই দৃষ্টি দিই না কেন সেটি ক্ষয় প্রাপ্ত হয় ও বিনষ্ট হয়। এটিও দয়ার এক নিদর্শন। সংসারের এইসব জিনিসের প্রতি দৃষ্টি দিলে আমরা এই শিক্ষাই পাই যে স্ত্রী, পুত্র, ধন, সংসারের সকল বস্তুই এবং আমাদের শরীরও ক্ষণভঙ্গুর এবং বিনাশশীল। এজন্য আমাদের উচিত এই সব বিষয় ভোগে আমাদের অমূল্য সময় নষ্ট না করা।

পরমাত্মার দয়া তো সমানভাবে সকলের উপর সব সময় বর্ষিত হয়। কিন্তু মানুষ যখন পরমাত্মার শরণাগত হয় তখন ঈশ্বর তার প্রতি বিশেষ দয়া করেন। স্বর্ণকার যেমন আগুনে পুড়িয়ে সোনাকে পবিত্র করে নেয় তেমনই পরমাত্মাও তাঁর ভক্তকে অনেক রকম বিপত্তির আগুনে পুড়িয়ে পবিত্র করে নেন। যখন প্রহ্লাদ ভগবানের শরণ নিয়েছিল তখন প্রথম প্রথম তার উপর কত রকমেরই না বিপত্তি এসেছিল। তাকে আগুনে পোড়ানো হয়েছিল, জলে ডোবানো হয়েছিল, বিষ খাওয়ানো হয়েছিল, তাকে অস্ত্রাঘাতে কাটা হয়েছিল। কিন্তু সে যতই বেশি করে সংকটে পতিত হচ্ছিল ততই সে উত্তরোত্তর পরমাত্মার দয়া অনুভব করেছিল। আর এই কারণেই সে পরম পবিত্র হয়ে শেষ পর্যন্ত পরমাত্মাকে লাভ করেছিল। লোকেদের দৃষ্টিতে এইটিই স্পষ্ট যে প্রহ্লাদকে অনেক দুঃখ সহ্য করতে হয়েছিল। তার প্রতি অনেক অত্যাচার করা হয়েছিল। তাকে বড় বড় বাধা বিপত্তির সম্মুখীন হতে হয়েছিল। কোনো কোনো সরল মানুষ তো এমন কথাও বলেন যে ভগবান তাঁর ভক্তকে বেশি করে কষ্ট দিয়ে থাকেন। কিন্তু সে বেচারা এই কথাটি

বোঝে না যে ভগবানের বিধানে এইসব কষ্টের মধ্যে কত বেশি মঙ্গল নিহিত আছে!

প্রহ্লাদের এই তত্ত্ব জানা ছিল। সেজন্য সে এই সব বিপত্তির মধ্যে পরমাত্মার দয়া প্রত্যক্ষ করত আর সেজন্য এইসব বিপত্তি তখনই মঙ্গলময় বিধানে পরিণত হয়ে যেত।

আপনারা প্রহ্লাদের চরিত্র পড়ুন, দেখবেন তার প্রতিটি কথার মধ্যে কত ধৈর্য, নির্ভয়তা, শান্তি, নিস্পৃহতা, নিষ্কামভাব এবং আনন্দ চমকিত হচ্ছে। আগুনে দগ্ধ না হওয়ায় প্রহ্লাদ বলেছে—

তাতৈষ বহ্নিঃ পবনেরিতোঽপি ন মাং দহত্যত্র সমন্ততোঽহম্।
পশ্যামি পদ্মাস্তরণাস্তৃতানি শীতানি সর্বাণি দিশাম্মুখানি॥

(বিষ্ণুপুরাণ ১।১৭।৪৭)

'হে পিতা! এই প্রচণ্ড বায়ুর দ্বারা প্রেরিত প্রজ্বলিত অগ্নিও আমাকে দগ্ধ করে না (এতে আপনি বিস্মিত হবেন না), কেননা আমি এই অগ্নির মধ্যে এবং নিজের মধ্যে সমভাবে সেই এক সর্বব্যাপী বিষ্ণুকে দেখি। সেজন্য আগুণের এই শিখাগুলি আমার কাছে চারিদিকে বিস্তৃত শীতল পদ্মপত্রের মতো সুখদায়ক বলে প্রতীত হয়।'

যখন গুরুপুত্র শণ্ডামর্কের দ্বারা সৃষ্ট কৃত্যা প্রহ্লাদকে হত্যা করতে অসমর্থ হয়ে শণ্ডামর্ককেই মেরে ফেলে তখন দয়াময় প্রহ্লাদ ভগবানকে বলতে শুরু করেছিলেন—

যথা সর্বগতং বিষ্ণুং মন্যমানোঽনপায়িনম্।
চিন্তয়াম্যরিপক্ষেঽপি জীবন্ত্বেতে পুরোহিতাঃ॥
যে হন্তুমাগতা দত্তং যৈর্বিষং যৈর্হুতাশনঃ।
যৈর্দিগ্গজৈরহং ক্ষুণ্ণো দষ্টঃ সর্পৈশ্চ যৈরপি॥
তেষ্বহং মিত্রভাবেন সমঃ পাপোঽস্মি ন ক্বচিৎ।
তথা তেনাদ্য সত্যেন জীবন্ত্বসুরযাজকাঃ॥

(বিষ্ণুপুরাণ ১।১৮।৪১-৪৩)

'যদি আমি সর্বগত এবং অক্ষয় শ্রীবিষ্ণুকে শত্রুপক্ষেও দেখি তাহলেও এই সব পুরোহিত জীবিত হয়ে যাবেন। যারা আমাকে মারবার জন্য এসেছিল, যারা আমাকে বিষ খাইয়েছিল, আগুন লাগিয়েছিল, যারা আমাকে পিষ্ট করেছিল, সর্পের দংশন করিয়েছিল—তাদের প্রতি যদি আমি মিত্রভাবে সমাহিত হই এবং যদি কোথাও আমার পাপবুদ্ধি না হয় তাহলে সেই সত্যের প্রভাবে এখনই এই পুরোহিতগণ যেন জীবিত হয়ে যান।' এর পর তারা সবাই বেঁচে ওঠে।

সাধনকালে ভগবানকে তাঁর ভক্তদের উপর যে বিপদ ঘটাতে দেখা যায় এবং কারও কারও মান, প্রতিষ্ঠা, সম্মান এবং সম্পত্তি তিনি কেড়ে নেন তা কী জন্য ? তাঁদের অজ্ঞানরূপী নিদ্রা থেকে জাগাবার জন্য, সাধনার প্রতিবন্ধকতাগুলিকে দূর করার জন্য, পাপ থেকে উদ্ধার করবার জন্য, ভীরুতা দূর করে তাঁদের বীর ও ধীর করবার জন্য, প্রকৃত ভক্তিকে বৃদ্ধি করার জন্য এবং তাঁদের এরূপ নির্মল কীর্তি বিস্তৃত করবার জন্য, যেগুলি কীর্তন করে লোকেরা পবিত্র হয়ে যাবে। কেননা বিপদের সময় ভগবানকে যতটা মনে পড়ে ততটা অনুকূলতায় পড়ে না। এজন্য কুন্তী ভগবানের কাছে বিপদের বর চেয়েছিলেন।

বিপদঃ সন্তু নঃ শশ্বত্তত্র তত্র জগদ্‌গুরো।
ভবতো দর্শনং যৎ স্যাদপুনর্ভবদর্শনম্‌॥

(শ্রীমদ্ভাবগবত ১।৮।২৫)

'হে জগদ্‌গুরু ! আমি চাইছি যে প্রতি পদে যেন সর্বদা আমার উপর বিপদ বর্ষিত হয়। তাহলে আমি সংসার থেকে মুক্তিদায়ী আপনার দুর্লভ দর্শন পেতে থাকব।'

তবে এটি কোনো নিয়ম নয় যে ভগবান যারা তাঁকে ভক্তি করেন তাঁদের বিপত্তিতে ফেলবেনই। অধিকারী যেমন হয়, ব্যবস্থাও তেমনই হয়ে থাকে।

আপনারা যদি লক্ষ্য করে দেখেন তাহলে আপনারা স্পষ্টই দেখতে পাবেন যে পরমাত্মার দয়া নিরন্তর বর্ষিত হচ্ছে। এই বর্ষণের শীতল

সুধাধারার আনন্দ তাঁরাই পান যাঁরা ভগবানের শরণাগত হয়ে তাঁর দয়ার দিকে মন দেন। দয়ার এমন অবিরত বর্ষণ হতে থাকলেও তাঁর প্রভাব না জানার ফলে লোকেরা এর দ্বারা উপকৃত হয় না। কেউ মূর্খতাবশত মাথার উপর ছাতা দেয় আর কেউ বা ঘরের মধ্যে ঢুকে পড়ে। কখনও কখনও বিশেষ বিশেষ দয়ায় পূর্ব সঞ্চিত পুণ্যের কারণে তাঁর প্রেম, প্রভাব, গুণ এবং রহস্যের অমৃতময় কথা না চাইতেই এবং বিনা প্রয়াসে স্বতঃই প্রাপ্ত হয়ে যায়, সেই তত্ত্ব বুঝতে না পারায় উপেক্ষা করে চলে যাওয়া হলো সেই অমৃতরূপী বৃষ্টি থেকে পালিয়ে গিয়ে ঘরে ঢুকে পড়া আর কথায় উপস্থিত থেকে আলস্য এবং নিদ্রাগ্রস্ত হওয়া হলো নিজেদের উপর ছাতা দেওয়া।

ঈশ্বরের দয়ার কথা আর কত বলা যাবে ? সকল জীবের মাথার উপর তাঁর হাত সর্বদা বর্তমান। কিন্তু অভাগা জীব সেই হাতকে দূরে সরিয়ে দেয়।

যখন কোনো জীব কিছু খারাপ কাজ করতে প্রস্তুত হয়ে যায় তখন প্রায়শই তার হৃদয় থেকে এই ধ্বনি উত্থিত হয় যে 'এটি খারাপ কাজ'। এই ধরনের যে সতর্কবাণী সেটিই হলো মাথার উপর ঈশ্বরের হাত। ঈশ্বর যথাসময়ে তাকে সাবধান করে দেন। মনে হয় যেন হৃদয়ে অবস্থিত কোনো পুরুষ এটি খারাপ কাজ বলে নিষেধ করছেন। কিন্তু কাম অথবা লোভের বশে ঈশ্বরের আদেশকে অবহেলা করে মানুষ খারাপ কাজে প্রবৃত্ত হয়ে যায়। এটিই হল সেই কৃপাসিন্ধুর কৃপাকে অবহেলা করা। অর্থাৎ নিজের মাথার উপর তাঁর যে হাত তাকে সরিয়ে দেওয়া।

বিভিন্ন সময়ে হৃদয়ে পরমেশ্বর উত্তম কর্ম করার প্রেরণা দিয়ে থাকেন। সাধন-ভজন, সেবা-সৎসঙ্গ প্রভৃতির জন্য হৃদয়ে স্ফুরণ হয়, কিন্তু মানুষ সেটিকে অবহেলা করে জাগতিক ভোগ এবং প্রমাদে আসক্ত হয়, এটিও সেই দয়াময়ের আমাদের মাথার উপরে যে হাত তাকে সরিয়ে দেওয়া।

এটি ছাড়াও যখন সংসারের ঐশ্বর্য অর্থাৎ স্ত্রী, পুত্র এবং টাকা-পয়সা লাভ হয়, যেগুলিকে আমরা সুখ এবং সম্পত্তি নাম দিয়ে থাকি, সেগুলিতেও কখনো কখনো ক্ষয় ও বিনাশের সম্ভাবনার সৃষ্টি হয় এবং

সেগুলিও স্বভাবত আমাদের কাছে ক্ষণভঙ্গুর ও নাশবান প্রতীত হয়। এই প্রতীতি হলেও আমরা সেগুলিকে ত্যাগ বা সেগুলির সদ্ব্যবহার করি না। এটিও সেই দয়াময় ঈশ্বরের হাতকে আমাদের মাথা থেকে সরিয়ে দেওয়া।

ঈশ্বরকে লাভ করার পথে বাধাস্বরূপ সংসারের ধন-মান-ঐশ্বর্য প্রভৃতি বিনষ্ট হয়ে গেলেও পুনরায় সেই ক্ষণভঙ্গুর, বিনাশশীল, দুঃখময় বস্তুগুলিকে লাভ করবার যে ইচ্ছা তাও সেই দয়াময়ের হাতকে আমাদের মাথার উপর থেকে সরিয়ে দেওয়া।

যখন ভগবানের নাম, রূপ, গুণ এবং প্রভাবের স্বতঃই স্ফুরণ হয় তখন বুঝতে হবে যে সেটি তাঁর সর্বাপেক্ষা বেশি দয়া। তবু আমরা তাঁকে ভুলে থাকি এবং তাঁকে স্মরণে রাখার যথোচিত প্রয়াস করি না। এটিও সেই দয়াময়ের হাতকে আমাদের মাথা থেকে দূরে সরিয়ে দেওয়া। সেজন্য আমাদের উচিত ভগবানের দয়াকে জানা এবং সর্বতোভাবে তাঁর রক্ষণাবেক্ষণে থেকে নিত্য নির্ভয় এবং পরম সুখী থাকা।

—— ০ ——

জীব সম্পর্কীয় প্রশ্নোত্তর

একজন ভদ্রলোক প্রশ্ন করেছেন 'এই দেহে জীব কোথা থেকে, কেমন করে এবং কেন আসে ; কী কী জিনিস সঙ্গে আনে, গর্ভ থেকে কী করে বার হয় এবং প্রাণ নির্গত হওয়ার পর কোথায়, কেমন করে এবং কেন যায় ? আর কী কী বস্তু সঙ্গে নিয়ে যায় ?' প্রশ্নকর্তা শাস্ত্র-প্রমাণ ও যুক্তিসহকারে উত্তর দেওয়ার জন্য অনুরোধ করেছেন।

বাস্তবে প্রশ্ন খুবই গূঢ়, এর যথার্থ উত্তর শুধু সর্বজ্ঞ যোগী মহাপুরুষেরাই দিতে পারেন। এই বিষয়ে আমার কিছু লেখা তো বিনোদ সদৃশ। আমি যা কিছু লিখছি তাকে সম্পূর্ণরূপে অভ্রান্ত এবং যথার্থ বলে মেনে নিতে কারো

প্রতি আমার আগ্রহ নেই। কেননা সেরকম কথা বলবার কোনো অধিকার আমার নেই। তবে অবশ্যই শাস্ত্র, সাধু-সন্তদের প্রসাদে আমি আমার সাধারণ বুদ্ধিতে যা কিছু বুঝেছি তাতে আমার কোনো সংশয় নেই।

এই বিষয়ে মনস্বীদের মধ্যে খুবই মতভেদ আছে। যাঁরা জীবের সত্তা কেবল মৃত্যু পর্যন্ত বলে মানেন এবং পুনর্জন্মাদি একেবারেই মানেন না তাঁদের তো কোনো কথাই নেই। কিন্তু যাঁরা পুনর্জন্ম মানেন তাঁদের মধ্যেও মতভেদ কম নেই। এই অবস্থায় অমুক মত সম্পূর্ণরূপে সত্য এমন কথা বলবার কোনো অধিকার আমার আছে বলে আমি মনে করি না। তবু নিজের চিন্তাকে পাঠকদের কাছে নম্রতার সঙ্গে এইজন্যই রাখছি যে তাঁরা যেন এবিষয়ে একটু ভেবে দেখেন।

বেদান্তের মতে সংসার মায়ার কাজ হওয়ায় বাস্তবে গমনাগমনের (জন্মান্তর) কোনো প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এই বিষয়টি বোঝাবার নয়, এটি হলো বাস্তবিক স্থিতি। এই স্থিতিতে উপনীত ব্যক্তিই এর যথার্থ রহস্য জানেন। প্রকৃত অর্থে যেখানে কেবলামত্র শুদ্ধ সৎ-চিৎ-আনন্দময় ব্রহ্ম ছাড়া আর সব কিছু অস্তিত্বহীন, সেখানে কিছুই বলা-কওয়া সম্ভব নয়। যেখানে আচরণের কথা সেখানে সৃষ্টি, জীব, জীবের কার্য, কর্মানুসারে জন্ম-জন্মান্তর এবং ভোগ প্রভৃতি সবই সত্য। সেজন্য এই দৃষ্টিতে এখানে এই বিষয়ে কিছু আলোচনা করা হচ্ছে।

জীব আগের যোনি থেকে, যোনি অনুসারে সম্পাদিত প্রারব্ধ কর্মের ফল ভোগার জন্য পূর্বকৃত শুভাশুভ কর্মরাশির অনন্ত সংস্কারগুলিকে সঙ্গে নিয়ে সূক্ষ্ম শরীরসহ বাধ্য হয়ে নতুন যোনিতে জন্ম নেয়। গর্ভ থেকে জন্ম নেওয়া জীব গর্ভকাল পূর্ণ হয়ে যাবার পর প্রসূতিরূপ অপান বায়ুর প্রেরণাতে বাইরে বেরিয়ে আসে এবং মৃত্যুর সময় প্রাণ বেরুবার পর সূক্ষ্ম শরীর ও শুভাশুভ কর্মরাশির সংস্কারগুলিসহ কর্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মাধ্যম এবং মার্গের দ্বারা কর্মজনিত বাসনানুসারে পরবশ হয়ে ভিন্ন ভিন্ন গতি প্রাপ্ত হয়। সংক্ষেপে এটিই হলো সিদ্ধান্ত। কিন্তু এত কথার দ্বারাও এই কথাটি ঠিক বোঝা যায় না,

শাস্ত্রের বিবিধ প্রসঙ্গে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণনা পাঠ করে ভ্রম উৎপন্ন হয়। সেজন্য কিছুটা বিস্তারিতভাবে আলোচনা করা হচ্ছে—

তিন প্রকারের গতি

ভগবান গীতায় মানুষের তিনটি গতির কথা বলেছেন—অধঃ, মধ্য ও ঊর্ধ্ব। তমোগুণের ফলে নিম্নের, রজোগুণের দ্বারা মধ্যের এবং সত্ত্বগুণের দ্বারা উচ্চ গতি প্রাপ্ত হয়। ভগবান বলেছেন—

ঊর্ধ্বং গচ্ছন্তি সত্ত্বস্থা মধ্যে তিষ্ঠন্তি রাজসাঃ।
জঘন্যগুণবৃত্তিস্থা অধো গচ্ছন্তি তামসাঃ॥

(গীতা ১৪।১৮)

'সত্ত্বগুণে স্থিত মানুষ স্বর্গাদি উচ্চলোকে যায়, রজোগুণে স্থিত রাজস মানুষ মধ্যে অর্থাৎ মনুষ্যলোকেই থাকে আর তমোগুণের কার্যরূপ নিদ্রা, প্রমাদ এবং আলস্যাদিতে স্থিত তামস ব্যক্তি অধোগতি অর্থাৎ কীট, পশু প্রভৃতি নীচ যোনি এবং নরক প্রাপ্ত হয়।' এটি মনে রাখতে হবে যে এই তিনটি গুণের কোনো একটি বা দুটি সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হয় না। সঙ্গ অথবা কর্মানুসারে কোনো একটি গুণ বাকি দুটি গুণকে দাবিয়ে রাখে। তমোগুণী ব্যক্তির সঙ্গতি এবং তমোগুণী কর্মদ্বারা তমোগুণ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে রজ ও সত্ত্বকে দমিত করে। রজোগুণী পুরুষের সঙ্গতি এবং কর্ম দ্বারা রজোগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে তম এবং সত্ত্বকে দমিত করে। আর এইভাবেই সত্ত্বগুণী পুরুষের সঙ্গতি এবং কর্মের দ্বারা সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে রজ এবং তমকে দমন করে (গীতা ১৪।১০)। যে সময়ে যে গুণটি বৃদ্ধি লাভ করে তাতেই মানুষের স্থিতি আছে বলে মনে করা হয় আর যে স্থিতিতে তার মৃত্যু হয় সেই অনুসারেই তার গতি হয়ে থাকে। নিয়ম হল এই যে, অন্তিম সময়ে মানুষ যে ভাবটিকে স্মরণ করতে করতে শরীর ত্যাগ করে সেই প্রকারের ভাবই সে লাভ করে (গীতা ৮।৬)। সত্ত্বগুণে স্থিতি হলে অন্তিমকালে শুভ ভাবনা এবং কামনা হয়ে থাকে। শুভ ভাবনায় সত্ত্বগুণের বৃদ্ধি অবস্থায় মৃত্যু হলে মানুষ নির্মল ঊর্ধ্ব লোকে যায়।

এখানে প্রশ্ন হল এই যে যদি বাসনানুসারেই ভাল-মন্দ লোকের প্রাপ্তি হয় তাহলে মানুষ অশুভ বাসনা কেন করবে ? সকলেই তো উত্তম লোক পাওয়ার জন্য উত্তম বাসনাই করবে। এর উত্তর হল অন্তিম কালের বাসনা বা কামনা নিজে থেকেই হয় না, তা প্রায়ই ব্যক্তির তাৎকালিক কর্মানুসারেই হয়ে থাকে। আয়ুর শেষ দিকে অর্থাৎ অন্তিম সময়ে মানুষ যে রকম কর্মে লিপ্ত থাকে মোটামুটি সেই অনুসারেই মৃত্যুর সময়ে তার বাসনা হয়ে থাকে। মৃত্যু কখন হবে তার কোনো নিশ্চয়তা নেই। সেজন্য মানুষের সদা সর্বদা উত্তম কর্মে লেগে থাকা উচিত। সর্বদা শুভ কর্মে লেগে থাকলে বাসনা শুদ্ধ হবে। সব সময় শুদ্ধ বাসনা থাকাই হল সত্ত্বগুণী স্থিতি। কেননা দেহের সকল দ্বারে চৈতন্য এবং বোধশক্তির সৃষ্টি হওয়াই হল সত্ত্বগুণ বৃদ্ধির লক্ষণ (গীতা ১৪।১১) আর এই স্থিতিতে মৃত্যু হওয়াই হল ঊর্ধ্বলোক প্রাপ্তির কারণ।

যারা মনে করে যে অন্তিমকালে সাত্ত্বিক বাসনা করে নেওয়া যাবে, এখনই তার প্রয়োজন কী, তারা খুবই ভুল করে। অন্তিমকালে সেই বাসনাই হবে যা আগে থেকেই হয়ে আসছে। সাধক যখন ধ্যান করতে বসেন, কিছুটা সময় সুস্থ ও একান্ত মনে পরমাত্মার চিন্তা করতে চান তখন দেখা যায় যে পূর্বের অভ্যাসের জন্য তাঁর মধ্যে প্রায়ই সেই কর্ম বা ভাবের স্ফুরণ হয় যাতে তিনি সর্বদা নিযুক্ত থাকেন। সেই সাধক বারবার মনকে বিষয় থেকে সরিয়ে নেওয়ার চেষ্টা করেন। তাকে ধিক্কার দেন, খুবই অনুশোচনা করেন তবু তাঁর পূর্বের অভ্যাস তাঁর বৃত্তিগুলিকে সব সময়ের কাজের দিকে টেনে নিয়ে যায়। ভগবানও বলেছেন—'সদা তদ্ভাবভাবিতঃ'। যখন মানুষ সতর্ক থাকা অবস্থাতেও মনের ভাবনাকে তৎক্ষণাৎ নিজের ইচ্ছাধীন করতে পারে না তখন সারা জীবনের অভ্যাসের বিরুদ্ধে মৃত্যুকালে সহজেই তার বাসনা শুভ হয়ে যাবে এমন মনে করা ভুল ছাড়া আর কিছুই নয়।

এমনই যদি হয় তাহলে আস্তে আস্তে নিরাসক্তি লাভ করা এবং বুদ্ধি দ্বারা মনকে পরমাত্মায় লীন করবার আজ্ঞা ভগবান কীকরে দেবেন ? (গীতা

৬।২৫)। এর দ্বারা এটিই প্রমাণিত হয় যে মানুষের ভাবনা তার কর্মানুসারেই হয়ে থাকে। যেমন অন্তিমকালের ভাবনা হয়, যে গুণে তার স্থিতি, সেই অনুসারে পরবশ হয়ে জীবকে কর্মফল ভোগ করবার জন্য অন্য যোনিতে যেতে হয়।

উর্ধ্বগতির দুটি ভেদ—উর্ধ্বগতির দুটি ভেদ আছে। এক হল, যেখান থেকে আর ফিরে আসতে হয় না। দুই হল, ফিরে আসতে হয়। একেই গীতা শুক্ল-কৃষ্ণ গতি এবং উপনিষদ দেবযান-পিতৃযান নামে বলেছে। সকামভাবে বেদোক্ত কর্মকারী স্বর্গপ্রাপ্তির প্রতিবন্ধক দৈবঋণরূপ পাপ থেকে মুক্ত পুণ্যাত্মা মানুষ ধূম-মার্গ দ্বারা পুণ্যলোক প্রাপ্ত করে সেখানে দিব্য দেবতাদের বিশাল-ভোগ করবার পর পুণ্য ক্রমশ ক্ষীণ হয়ে গিয়ে আবার মৃত্যু-লোকে ফিরে আসেন। আর নিষ্কামভাবে ভগভদ্‌ভক্তি অথবা ঈশ্বরার্পণ বুদ্ধির দ্বারা ভেদজ্ঞানযুক্ত শ্রৌতস্মার্ত (বেদানুমত-স্মৃতিশাস্ত্র সম্বন্ধীয়) কর্মকারী পরোক্ষভাবে পরমেশ্বরকে জ্ঞাত যোগীরা ক্রমশ ব্রহ্মকে লাভ করেন। ভগবান বলেছেন—

অগ্নির্জ্যোতিরহঃ শুক্লঃ ষণ্মাসা উত্তরায়ণম্।
তত্র প্রয়াতা গচ্ছন্তি ব্রহ্ম ব্রহ্মবিদো জনাঃ॥
ধূমো রাত্রিস্তথা কৃষ্ণঃ ষণ্মাসা দক্ষিণায়নম্।
তত্র চান্দ্রমসং জ্যোতির্যোগী প্রাপ্য নিবর্ততে॥
শুক্লকৃষ্ণে গতী হ্যেতে জগতঃ শাশ্বতে মতে।
একয়া যাত্যনাবৃত্তিমন্যয়াবর্ততে পুনঃ॥

(গীতা ৮।২৪-২৬)

'অগ্নির্জ্যোতি, দিন, শুক্ল পক্ষ, উত্তরায়ণের ছয় মাস—এই সময় দেবতাদের এই লক্ষিত পথে গিয়ে ব্রহ্মোপাসকগণ ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হন। ধূম, রাত্রি, কৃষ্ণপক্ষ, দক্ষিণায়নের ছয় মাস, এই সময়ে অর্থাৎ এইসকল দেবতাদের এই লক্ষিত পথে গিয়ে সকাম কর্মী পুরুষ স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়ে সেখানে কর্মফল ভোগ করার পর আবার সংসারে পুনরাবৃত্ত হন। জগতের

শুক্ল (প্রকাশময়) ও কৃষ্ণ (অন্ধকারময়)—এই দুটি পথ অনাদি বলে প্রসিদ্ধ। একটি দ্বারা মোক্ষ লাভ হয়, অন্যটির দ্বারা পুনর্জন্ম অর্থাৎ জন্ম-মৃত্যু চক্রে আবর্তিত হতে হয়।'

শুক্ল—অর্চি অথবা দেবযানমার্গ দিয়ে প্রবিষ্ট যোগী প্রত্যাবর্তন করেন না এবং কৃষ্ণ—ধূম অথবা পিতৃযান মার্গে প্রবিষ্ট যোগীকে প্রত্যাবর্তন করতে হয়। শ্রুতি বলে—

'তে য এবমেতদ্বিদুর্যে চামী অরণ্যে শ্রদ্ধাঁ সত্যমুপাসতে তেঽর্চিরভিসম্ভবন্তি, অর্চিষোঽহরহ্ন আপূর্যমাণপক্ষমাপূর্যমাণপক্ষাদ্যান্ ষণ্মাসানুদঙ্ঙাদিত্য এতি মাসেভ্যো দেবলোকং দেবলোকাদাদিত্যমাদিত্যাদ্বৈদ্যুতং তান্ বৈদ্যুতান্ পুরুষো মানস এত্য ব্রহ্মলোকান্ গময়তি তে তেষু ব্রহ্মলোকেষু পরাঃ পরাবতো বসন্তি তেষাং ন পুনরাবৃত্তিঃ।'

(বৃহদারণ্যক উপনিষদ্ ৬।২।১৫)

'যাঁর জ্ঞান হয়, যিনি অরণ্যে সশ্রদ্ধ চিত্তে সত্যের উপাসনা করেন তিনি অর্চি (শিখা) রূপ হন, অর্চি থেকে দিনরূপ হন, দিন হতে শুক্লপক্ষরূপ হন, শুক্লপক্ষ থেকে উত্তরায়ণরূপ হন, উত্তরায়ণ থেকে দেবলোকরূপ হন, দেবলোক থেকে আদিত্যরূপ হন, আদিত্য থেকে বিদ্যুৎরূপ হন, এখান থেকে অমানব পুরুষ তাঁকে ব্রহ্মলোকে নিয়ে যান, সেখানে অনন্ত বর্ষ পর্যন্ত তিনি থাকেন, তাকে প্রত্যাবর্তন করতে হয় না।' এটি হলো দেবযান মার্গ। এবং—

'অথ যে যজ্ঞেন দানেন তপসা লোকাঞ্জয়ন্তি তে ধূমমভিসম্ভবন্তি ধূমাদ্রাত্রিঁ রাত্রেরপক্ষীয়মাণপক্ষমপক্ষীয়মাণপক্ষাদ্যান্ ষণ্মাসান্ দক্ষিণাদিত্য এতি মাসেভ্যঃ পিতৃলোকং পিতৃলোকাচ্চন্দ্রং তে চন্দ্রং প্রাপ্যান্নং ভবন্তি তাঁস্তত্র দেবা যথা সোমঁরাজানমাপ্যায়স্বাপক্ষীয়স্বেত্যেবমেনাঁ স্তত্র ভক্ষয়ন্তি...........' (৬।২।১৬)।

'যিনি সকামভাবে যজ্ঞ, দান তথা তপস্যার দ্বারা লোক প্রাপ্ত করেন তিনি ধূম প্রাপ্ত হন, ধূম থেকে রাত্রিরূপ হয়ে যান, রাত্রি থেকে কৃষ্ণপক্ষরূপ হন,

কৃষ্ণপক্ষ থেকে দক্ষিণায়নকে প্রাপ্ত হন, দক্ষিণায়ন থেকে পিতৃলোককে এবং সেখান থেকে চন্দ্রলোককে প্রাপ্ত হন, চন্দ্রলোক লাভ করার পর তিনি অন্নরূপ হন....... এবং দেবতা তাকে ভক্ষণ করেন।' এখানে 'অন্ন' হওয়া এবং 'ভক্ষণ' করার অর্থ হলো এই যে দেবতাদের খাদ্যবস্তুতে প্রবিষ্ট হয়ে তাঁদের দ্বারা ভক্ষিত হন এবং তারপর তাঁদের দ্বারা দেবরূপে উৎপন্ন হন। অথবা 'অন্ন' শব্দের দ্বারা সেইসব জীবকে দেবতাদের আশ্রিত বলে বোঝা যায়। পরিচারককেও অন্ন বলা হয়, সেবা করে যেসব পশু তাদেরও অন্ন বলা হয়, **'পশবঃ অন্নম্'**। এইসব কথাতে এটি সিদ্ধ হয়, তাঁরা দেবতাদের পরিচারক হওয়ায় নিজেদের সুখ থেকে বঞ্চিত হতে পারেন না। এই হলো পিতৃযানমার্গ।

এই সব হলেন ধূম, রাত্রি এবং অর্চি, দিন প্রভৃতি নামক ভিন্ন ভিন্ন লোকে স্থিত দক্ষিণায়ণাভিমানিনী দেবতা। তাঁদের রূপও তাঁদের নামানুসারেই হয়ে থাকে। জীব এই দেবতাদের মতো রূপ লাভ করে ক্রমশ অগ্রসর হতে থাকে। এগুলির মধ্য থেকে অর্চিমার্গবিশিষ্ট প্রকাশময় লোকের মার্গ থেকে প্রকাশ পথের অহংকারী দেবতা দ্বারা তাঁদের ক্রমশ বিদ্যুৎলোক পর্যন্ত নিয়ে যান, সেখান থেকে অমানব পুরুষ (ভগবৎ পার্ষদ)-গণের দ্বারা খুবই সম্মানের সঙ্গে ভগবানের সর্বোত্তম দিব্য পরম ধামে পৌঁছিয়ে যান। একেই ব্রহ্মোপাসক ব্রহ্মলোকের অন্তিমভাগ—সর্বোচ্চ গতি ; শ্রীকৃষ্ণের উপাসকের দিব্য গোলক, শ্রীরামের উপাসকের দিব্য সাকেতলোক ; শৈবের শিবলোক ; জৈনের মোক্ষশিলা, মুসলমানের সপ্তমআকাশ এবং খ্রিষ্টানেরা স্বর্গ বলেন। উপনিষদে একেই বিষ্ণুর পরমধাম বলা হয়েছে। এই দিব্যধামে প্রবিষ্ট মহাপুরুষেরা সমস্ত লোক এবং মার্গকে অতিক্রম করে এক প্রকাশময় দিব্য স্থানে স্থিত হন। সেখানে তাঁরা সকল সিদ্ধি এবং সকল প্রকারের শক্তি লাভ করেন। তাঁরা কল্প পর্যন্ত অর্থাৎ ব্রহ্মার আয়ু পর্যন্ত সেই দিব্য ধামে থেকে শেষে ভগবানের সঙ্গে মিশে যান। অথবা ভগবদিচ্ছায় ভগবানের অবতারদের মতো বন্ধনমুক্ত অবস্থাতেই লোক হিতার্থে

সংসারে আসেন। এই রকম মহাপুরুষদের কারক-পুরুষ বলা হয়।

ধূমমার্গের অভিমানী দেবতারা এবং তাঁদের লোকও প্রকাশময়। কিন্তু তাঁদের প্রকাশ অর্চিমার্গীদের থেকে স্বতন্ত্র এবং তাঁরা জীবকে মায়াময় বিষয় ভোগ করার মার্গে নিয়ে গিয়ে এমন লোকে পৌঁছিয়ে দেন যে সেখান থেকে ফিরে আসতে হয়। এজন্য এঁদের অন্ধকারের অভিমানী দেবতা বলা হয়েছে। এই মার্গেও জীব দেবতাদের তদ্রূপতা প্রাপ্ত করে চাঁদের রশ্মির রূপ নিয়ে সেই দেবতাদের দ্বারা প্রবিষ্ট চন্দ্রলোক লাভ করে। আর সেখানে ভোগান্তে পুণ্যক্ষয় হলে ফিরে আসে।

প্রত্যাবর্তনের ক্রম—স্বর্গাদি থেকে ফিরে আসবার ক্রম উপনিষদের অনুসারে নিম্নরূপ—

'তস্মিন্যাবৎসসম্পাতমুষিত্বাথৈতমেবাধ্বানং পুনর্নিবর্তন্তে, যথৈতমা-কাশমাকাশদ্বায়ুং বায়ুর্ভূত্বা ধূমো ভবতি, ধূমো ভূত্বাভ্রং ভবতি। অভ্রং ভূত্বা মেঘো ভবতি, মেঘো ভূত্বা প্রবর্ষতি, ত ইহ ব্রীহিয়বা ওষধিবনস্পতয়স্তিলমাষা ইতি জায়ন্তেঽতো বৈ খলু দুর্নিষ্প্রপতরং যো যো হ্যন্নমত্তি যো রেতঃ সিঞ্চতি তদ্ভূয় এব ভবতি।'

(ছান্দোপনিষদ্ ৫।১০।৫-৬)

কর্মভোগ শেষ না হওয়া পর্যন্ত দেবভোগ ভোগ করবার পর সেখান থেকে পতনের সময় জীব প্রথমে আকাশরূপ হয়, আকাশ থেকে বায়ু, বায়ু থেকে ধূম, ধূম থেকে অভ্র এবং অভ্র থেকে মেঘ হয়। মেঘ থেকে জলরূপে বর্ষিত হয় এবং ভূমি, পর্বত, নদী প্রভৃতিতে পতিত হয়ে ক্ষেতে ধান, যব, ওষধি, বনস্পতি, তিল প্রভৃতি খাদ্য পদার্থে সম্বন্ধিত হয়ে মানুষের দ্বারা ভক্ষিত হয়। এইভাবে মানুষের শরীরে পৌঁছিয়ে রস, রক্ত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি প্রভৃতি হয়ে অন্তিমে বীর্যে সম্মিলিত হয়ে শুক্র সিঞ্চনের সঙ্গে মায়ের যোনিতে প্রবেশ করে। সেখানে গর্ভকালের সময় পর্যন্ত মায়ের খাওয়া অন্ন-জলে পুষ্ট হয়ে যথাসময়ে অপান বায়ুর প্রেরণায় মল-মূত্রের মতো বেগ প্রাপ্ত হয়ে স্থূলরূপে বাহিরে নির্গত হয়। কেউ কেউ এমন কথাও

মানেন যে গর্ভে শরীর পূর্ণরূপে গঠিত হয়ে যাওয়ার পর তাতে জীব আসে। কিন্তু এই কথা ঠিক বলে মনে হয় না। চৈতন্য ছাড়া গর্ভে শিশুর বৃদ্ধি পাওয়া সম্ভব নয় আর এমন কথা বলা যুক্তি ও নিয়মের বিরোধী। এখানে যেসব জীব ফিরে আসে তারা কর্মানুসারে মানুষ অথবা পশু আদি যোনি প্রাপ্ত হয়। শ্রুতি বলেন—

'তদ্য ইহ রমণীয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে রমণীয়াং যোনিমাপদ্যেরন্-ব্রাহ্মণযোনিং বা ক্ষত্রিয়যোনিং বা বৈশ্যযোনিং বাথ য ইহ কপূয়চরণা অভ্যাশো হ যত্তে কপূয়াং যোনিমাপদ্যেরঞ্শ্বযোনিং বা সূকরযোনিং বা চাণ্ডালযোনিং বা।' (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৫।১০।৭)

'এদের মধ্যে যাঁদের আচরণ ভাল হয় অর্থাৎ যাঁদের পুণ্য সঞ্চয় হয় তাঁরা শীঘ্রই কোনো ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় অথবা বৈশ্যের রমণীয় যোনি প্রাপ্ত করেন। তেমনই যাদের আচরণ খারাপ হয় অর্থাৎ যাদের পাপ সঞ্চয় হয়ে থাকে তারা কোন কুকুর, শূকর অথবা চণ্ডালের অধম যোনি প্রাপ্ত করে।'

ঊর্ধ্বগতির ভেদ এবং একটিতে ফিরে না আসা ও অন্যটিতে ফিরে আসার ক্রম বলা হল।

মধ্যগতি—মধ্যগতি বা মনুষ্যলোক প্রাপ্ত জীবদের রজোগুণ বৃদ্ধির সময় মৃত্যু হলে তাঁদের প্রাণবায়ু, সূক্ষ্ম শরীর সহ সমষ্টি-লৌকিক বায়ুতে মিশে যায়। ব্যষ্টি-প্রাণবায়ুকে সমষ্টি-প্রাণবায়ু নিজের মধ্যে মিশিয়ে এই লোকে যে যোনিতে জীবের জন্ম হওয়া উচিত তার খাদ্যবস্তুতেই তাকে পৌঁছিয়ে দেয়। এই বায়ু দেবতাই এর যোনি পরিবর্তনের প্রধান মাধ্যম। এটি সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের আদেশ এবং তার অভ্রান্ত বিধান অনুসারে জীবকে তার কর্মানুসারে ভিন্ন ভিন্ন মানুষের খাদ্যবস্তুর দ্বারা তার পাকাশয়ে পৌঁছিয়ে দিয়ে যথোপযুক্ত প্রকারে বীর্যরূপে পরিণত করে মনুষ্যরূপে জন্মদান করে।

অধোগতি—অধোগতিপ্রাপ্ত জীব হল তারা যারা অনেক রকম পাপকর্মের দ্বারা নিজেদের সমস্ত জীবনকে কলঙ্কিত করেছে। তাদের অন্তিমকালের বাসনা কর্মানুসারে তমোময়ই হয়ে থাকে। তার ফলে তারা

নীচ গতি প্রাপ্ত হয়।

যেসব লোক অহংকার, বল, দম্ভ, কাম এবং ক্রোধপরায়ণ হয়, পর-নিন্দা করে, নিজের তথা অন্যের শরীরস্থিত অন্তর্যামী পরমেশ্বরকে দ্বেষ করে সেই রকম বিদ্বেষী, পাপাচারী, ক্রূরকর্মী নরাধম মানুষ সৃষ্টির নিয়ন্ত্রণকারী ভগবানের বিধানে বারম্বার আসুরী যোনিতে জন্ম নেয় এবং পরে তারা তার চেয়েও বেশি নিকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয় (গীতা ১৬।১৮-২০)।

এই নীচ গতিতে গমনের প্রধান হেতু হলো কাম, ক্রোধ এবং লোভ। এই তিনটির দ্বারা আসুরী-সম্পদ সংগৃহীত হয়। এইজন্যই ভগবান এইগুলিকে ত্যাগ করার আদেশ দিয়েছেন—

ত্রিবিধং নরকস্যেদং দ্বারং নাশনমাত্মনঃ।
কামঃ ক্রোধস্তথা লোভস্তস্মাদেতত্ত্রয়ং ত্যজেৎ॥

(গীতা ১৬।২১)

'কাম, ক্রোধ তথা লোভ—এই তিনটি হল নরকের দ্বার অর্থাৎ এইগুলি সকল অনর্থের মূল এবং নরক প্রাপ্তির হেতু। এগুলি আত্মাকে পতিত করে অর্থাৎ আত্মাকে অধোগতিতে নিয়ে যায়। এজন্য এই তিনটিকে ত্যাগ করা উচিত।'

নীচ গতির দুটি ভেদ—যেসব লোক আত্ম-পতনের কারণভূত কাম, ক্রোধ, লোভে আচ্ছন্ন থেকে আসুরী, রাক্ষসী এবং মোহিনী সম্পদযুক্ত পুঁজী একত্র করে, গীতার উপরোক্ত সিদ্ধান্ত অনুসারে তাদের গতির প্রধানত দুটি ভেদ হয়ে থাকে—

(১) বার বার তির্যক প্রভৃতি যোনিতে জন্ম নেওয়া এবং (২) তার চেয়েও নিকৃষ্ট ভূত, প্রেত, পিশাচাদি গতি অথবা কুম্ভীপাক, অবীচি, অসিপত্র প্রভৃতি নরক প্রাপ্ত করে সেখানকার লোমহর্ষক দারুণ যন্ত্রণা ভোগ করা।

এদের মধ্যে যারা তির্যকাদি যোনিতে যায় সেইসব জীব মৃত্যুর পরে সূক্ষ্ম শরীরের দ্বারা সমষ্টি বায়ুর সঙ্গে মিলিত হয়ে জরায়ুজ যোনির খাদ্যবস্তুতে

মিশে গিয়ে বীর্যের দ্বারা শরীরে প্রবেশ করে গর্ভকাল সমাপ্ত হলে জন্ম নেয়। এইভাবে অন্ডজ প্রাণীদেরও জন্ম হয়। উদ্ভিজ্জ, স্বেদজ জীবের জন্মেও বায়ু দেবতাই কারণ। জীবের প্রাণবায়ুকে সমষ্টি-বায়ু দেবতা নিজের রূপে সম্মিলিত করে জল-ঘর্ম প্রভৃতির দ্বারা স্বেদজ প্রাণীদের এবং পৃথিবী-জল প্রভৃতির সঙ্গে তাদের সম্বন্ধ স্থাপন করে বীজে প্রবেশ করিয়ে মৃত্তিকার দ্বারা সৃষ্ট বৃক্ষাদি জড় যোনি সৃষ্টি করায়।

এই বায়ু দেবতাই যমরাজের দূতের স্বরূপে সেই পাপীদের প্রত্যক্ষ হন যারা নারকী অথবা প্রেতাদি যোনিতে যাবে। এর আলোচনা গরুড়পুরাণ এবং অন্যান্য যেসব পুরাণে পাপীদের গতির বর্ণনা করা হয়েছে সেখানে করা হয়েছে। এই সমস্ত কাজ সকলের প্রভু এবং নিয়ন্তা ঈশ্বরের শক্তিতে এমন সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হয় যে তাতে কোথাও কোনো ভুলের সম্ভাবনা থাকে না। এই পরমাত্মশক্তির দিক থেকে নিযুক্ত দেবতাদের দ্বারা বশবর্তী হয়ে জীব অধম, মধ্যম ও উত্তম গতিতে যাতায়াত করে। এই নিয়ন্ত্রণ যদি না থাকতো তাহলে জীব অন্তত পাপের ফল ভোগার জন্য কোথাও যেত না এবং ভুগতেও বাধ্য হোত না। অবশ্যই সুখ ভোগের জন্য জীব লোকান্তরে যেতে চায় কিন্তু নিয়ে যাবার কেউ না থাকায় এবং মার্গ সম্পর্কে অনভিজ্ঞ বলে সেখানে যেতে পারে না।

জীব সঙ্গে কী নিয়ে আসে, কী নিয়ে যায়—এখন প্রধানত এই কথা বলা বাকি থেকে গেল যে জীব নিজের সঙ্গে কি কি নিয়ে যায় এবং কি নিয়ে আসে। যে সময়ে জীব জাগ্রত অবস্থায় থাকে সেই সময় তার স্থিতি স্থূল শরীরে হয়। তখন তার সম্বন্ধ পাঁচটি প্রাণ সহ চব্বিশতত্ত্বে থাকে। পাঁচটি মহাভূত (আকাশ, বায়ু, অগ্নি, জল এবং ক্ষিতি—এই পাঁচটির সূক্ষ্ম ভাবস্বরূপ), অহংকার, বুদ্ধি, মন, ত্রিগুণময়ী মূল প্রকৃতি, চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা, ত্বক—এই পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয় ; বাণী, হাত, পা, লিঙ্গ, গুহ্য—এই পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং রূপ, রস, গন্ধ, শব্দ, স্পর্শ— এইগুলি হল ইন্দ্রিয়ের পাঁচটি বিষয় (গীতা ১৩।৫)। এই হলো চব্বিশটি তত্ত্ব। পঞ্চ

মহাভূতের অন্তর্গত হওয়ায় এই তত্ত্বের নির্ণয়কারী আচার্যগণ প্রাণবায়ুরই ভেদ হওয়ায় প্রাণকে আলাদা ভাবে উল্লেখ করেননি। যোগ, সাংখ্য, বেদান্ত প্রভৃতি শাস্ত্রানুসারে প্রধানত তত্ত্ব হল চব্বিশ। প্রাণবায়ুকে আলাদা মনে করার প্রয়োজন নেই। ভেদটি জানাবার জন্যই প্রাণ, অপান, সমান, ব্যান, উদান নামে বায়ুর পাঁচটি রূপ মনে করা হয়েছে।

স্বপ্নাবস্থায় জীবের স্থিতি সূক্ষ্ম শরীরে থাকে। সূক্ষ্ম শরীরে সতেরোটি তত্ত্ব মানা হয়েছে—পাঁচটি প্রাণ, পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, সেগুলির কারণস্বরূপ পাঁচটি সূক্ষ্ম তন্মাত্রা এবং মন ও বুদ্ধি । এই হল সতেরটি তত্ত্ব। কোনো কোনো আচার্য পাঁচটি সূক্ষ্ম তন্মাত্রার জায়গায় পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়কে গ্রহণ করেছেন। পঞ্চ তন্মাত্রায় কর্মেন্দ্রিয়গুলিকে জ্ঞানেন্দ্রিয়ের অন্তর্গত মান্য করা হয় আর যাঁরা পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয়কে মানেন তাঁরা পঞ্চ তন্মাত্রাকে তাঁদের কার্যরূপ ইন্দ্রিয়ের অন্তর্গত বলে মেনে নেন। যেভাবেই মানুন না কেন অধিকাংশ মনস্বী সতেরোটি তত্ত্বের কথাই বলেন। কোথাও এগুলির কিছু বিস্তার আবার কোথাও কিছু সংক্ষেপ করা হয়েছে।

এই সূক্ষ্ম শরীরে তিনটি কোষ অন্তর্গত বলে মান্য হয়েছে—প্রাণময়, মনোময় এবং বিজ্ঞানময়। (সর্বসমেত পাঁচটি কোষের মধ্যে স্থূল দেহ হল অন্নময় কোষ। এই পাঞ্চভৌতিক শরীর হল পাঁচটি ভূতের ভাণ্ডার। তা আছে এর ভিতরের সূক্ষ্ম শরীরে) প্রথমে প্রাণময় কোষ, এতে আছে পঞ্চ প্রাণ। তার ভিতরে আছে মনোময় কোষ, এতে আছে মন এবং ইন্দ্রিয়। এর মধ্যে আছে বিজ্ঞানময় (বুদ্ধিরূপ) কোষ, এতে বুদ্ধি এবং পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় আছে। এই হল সতেরোটি তত্ত্ব। স্বপ্নে এই সূক্ষ্মরূপের অহংকারী জীবই পূর্বের ঘটনাবলী নিজের ভিতরে সূক্ষ্মরূপে দেখে।

এর স্থিতি যখন কারণ-শরীরে হয় তখন প্রকৃতিরূপী অবিকৃত মায়ার এক তত্ত্বের সঙ্গে এর সম্বন্ধ থাকে। এই সময় সকল তত্ত্ব সেই কারণরূপ প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। এইজন্য সেই জীবের কোনো বিষয়ের জ্ঞান থাকে না। এই গাঢ় নিদ্রাবস্থাকে সুষুপ্তি বলে। মায়াসহ ব্রহ্মে বিলুপ্ত হওয়ার কারণে

সেই সময় জীবের সম্বন্ধ সুখের সঙ্গে হয়। সেজন্য একে আনন্দময় কোষ বলা হয়। এই জন্যই এই অবস্থা থেকে জাগ্রত হলে লোকে বলে যে 'আমি খুব আরামে ঘুমিয়েছি'—তার অন্য কোনো বিষয়ে জ্ঞান থাকে না। এইটিই হলো অজ্ঞান অবস্থা, এই অজ্ঞান অবস্থার নামই হলো মায়া, প্রকৃতি। আরামে ঘুমিয়েছি, তাতে প্রমাণিত হলো যে তার আনন্দের অনুভূতি হয়েছিল। সুখরূপেতে নিত্য স্থিত হলেও সে প্রকৃতি অর্থাৎ অজ্ঞানে থাকার কারণে ফিরে আসে। ঘড়ায় জল ভর্তি করে তার মুখ ভাল করে বন্ধ করার পর তাকে যদি সমুদ্রের অগাধ জলে ডুবিয়ে দেওয়া হয় এবং তারপর সেই ঘড়াকে তোলা হয় তাহলে ঘড়ার জল যেমনকার তেমনই থাকে। যদি ঘড়া না থাকত তাহলে সেই জল অনন্ত সমুদ্রে মিশে একাকার হয়ে যেত। তেমনই অজ্ঞান অবস্থায় থাকার কারণে সুখরূপ ব্রহ্মে স্থিত হওয়ার পরেও জীবকে যেমনকার তেমন অবস্থাতেই ফিরে আসতে হয়।

চব্বিশ তত্ত্ববিশিষ্ট স্থূল শরীর থেকে বর্হিগত হয়ে জীব যখন বাইরে আসে তখন স্থূল দেহ এখানেই থেকে যায়। প্রাণময় কোষবিশিষ্ট সতেরোটি তত্ত্বের সূক্ষ্ম শরীর এ থেকে বাইরে এসে অন্য শরীরে চলে যায়। ভগবান বলেছেন—

মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ।
মনঃষষ্ঠানীন্দ্রিয়াণি প্রকৃতিস্থানি কর্ষতি॥
শরীরং যদবাপ্নোতি যচ্চাপ্যুৎ ক্রামতীশ্বরঃ।
গৃহীত্বৈতানি সংযাতি বায়ুর্গন্ধানিবাশয়াৎ॥

(গীতা ১৫।৭-৮)

'এই দেহে এই জীবাত্মা আমারই সনাতন অংশ আর সেই জীবাত্মাই এই ত্রিগুণময়ী মায়ায় স্থিত পাঁচটি ইন্দ্রিয়কে আকর্ষণ করে। যেমন বায়ু গন্ধের স্থান থেকে গন্ধকে গ্রহণ করে নিয়ে যায় তেমনই দেহ প্রভৃতির প্রভু জীবাত্মাও যে প্রথম শরীরকে ত্যাগ করে তার থেকে মনসহ ইন্দ্রিয়গুলিকে গ্রহণ করে পরে যে শরীরটি পায় তাতে প্রবেশ করে।'

প্রাণবায়ুই হল তার শরীর। তার সঙ্গে প্রধানত পাঁচটি ইন্দ্রিয় এবং মন (অন্তঃকরণ) যায়। এরই বিস্তার হল সতেরোটি তত্ত্ব। এই সতেরোটি তত্ত্বের শরীর শুভাশুভ কর্মের সংস্কারসহ জীবের সঙ্গে যায়।

এখানে একটি প্রশ্ন উঠতে পারে শ্রীমদ্ভাগবদ্গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের বাইশতম শ্লোকে বলা হয়েছে—

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্লাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

'মানুষ যেমন পুরাতন বস্ত্র ত্যাগ করে অন্য নতুন বস্ত্র গ্রহণ করে, তেমনই জীবাত্মা পুরাতন শরীর ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর প্রাপ্ত করে।' এর অর্থ যদি এই করা হয় যে শরীর থেকে নির্গত হওয়া মাত্র জীব অন্য শরীরে প্রবেশ করে তাহলে অন্য শরীর তো আগে থেকেই প্রস্তুত করে রাখতে হবে আর অন্য শরীর যদি প্রস্তুত থেকেই থাকে তাহলে পুনর্জন্ম, স্বর্গ-নরক ভোগের কথা কীকরে সিদ্ধ হবে আর গীতা যখন নিজেই তিনটি গতির কথা নির্দিষ্ট করে গমনাগমন স্বীকার করেন তাতে পরস্পর বিরোধ প্রতিপন্ন হয়। এর কী উত্তর ?

এর উত্তর হল এই যে, এমন প্রশ্ন করা অমূলক। কেননা ভগবান এই মন্ত্রে এমন কথা বলেননি যে মৃত্যু হওয়ার পর তখনই জীব অন্য 'স্থূল' শরীর পাবে। কোনো লোক কয়েকটি জায়গা ঘুরে বাড়ি ফেরার পর তার ভ্রমণের বিবরণ দিতে গিয়ে বলল 'আমি বোম্বাই থেকে কলকাতা গিয়েছিলাম, সেখান থেকে কানপুর এবং তারপর কানপুর থেকে দিল্লী চলে এসেছি।' এই কথা থেকে কি এমন মনে হয় যে বোম্বাই ছাড়া মাত্র সে কলকাতা পৌঁছিয়ে গিয়েছিল এবং কানপুর থেকে দিল্লীও সে সেই সময়েই পৌঁছিয়ে গিয়েছিল ? রাস্তার বর্ণনা স্পষ্ট না থাকলেও তার ভিতরে তা আছে। এইভাবেই জীবেরও দেহ পরিবর্তনের জন্য লোকান্তরে যাওয়া ধরে নিতে হবে। এখন কেবলমাত্র নতুন দেহ পাওয়ার কথা বলা বাকি রইল। দেহ তো পাওয়া যাবেই কিন্তু তা স্থূল নয়। সমষ্টি-বায়ুর সঙ্গে সূক্ষ্ম শরীর মিশে গিয়ে

এক বায়ুময় দেহ সৃষ্টি হয়, সেটি ঊর্ধ্বগামীদের প্রকাশময় তেজস, নরকগামীদের তমোময় প্রেত-পিশাচ প্রভৃতি হয়। এটি সূক্ষ্ম হওয়ায় আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে দৃষ্ট হয় না। সেইজন্য এই শঙ্কা নিরর্থক। সূক্ষ্ম দেহের যাওয়া-আসা কর্মবন্ধন শেষ না হওয়া পর্যন্ত চলতে থাকে।

প্রলয়কালেও সূক্ষ্ম শরীর থাকে—প্রলয়কালেও জীবের এই সতেরো তত্ত্বের শরীর ব্রহ্মার সমষ্টি-সূক্ষ্ম শরীরে নিজ নিজ সঞ্চিত কর্ম-সংস্কারসহ বিশ্রাম করে এবং সৃষ্টির আদিতে তার দ্বারাই আবার এর সৃষ্টি হয়ে যায় (গীতা ৮।১৮)। মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মাসহ সমষ্টি-ব্যষ্টি সমগ্র সূক্ষ্ম-শরীর ব্রহ্মার লয় হয়ে গেলে বিলীন হয়ে যায়। সেই সময় এক মূল প্রকৃতি থাকে, তাকে অব্যাকৃত মায়া বলে। সেই মহাকারণে জীবের সমস্ত কারণ-শরীর অভুক্ত কর্ম সংস্কারের সঙ্গে অবিকশিত রূপে বিশ্রাম নেয়। সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টির আদি পুরুষের দ্বারা এরা সকলে আবার সৃষ্ট হয় (গীতা ১৪।৩-৪)। অর্থাৎ পরমাত্মারূপ অধিষ্ঠাতার সমীপে প্রকৃতিই চরাচরসহ এই জগৎকে সৃষ্টি করে। এইভাবে এই সংসার ঘূর্ণায়মান চক্রের মতো পরিবর্তিত হতে থাকে (গীতা ৯।১০)। মহাপ্রলয়ের সময় পুরুষ এবং তার শক্তিরূপা প্রকৃতি—এই দুটিই থেকে যায়। ওই সময় অজ্ঞানতায় আবিষ্ট জীবেরা প্রকৃতিসহ পুরুষের মধ্যে বিলুপ্ত থাকে। এর ফলেই সৃষ্টির আদিতে তাদের পুনরুত্থান হয়।

গমনাগমন থেকে মুক্ত হওয়ার উপায়

যতক্ষণ পর্যন্ত না নিষ্কাম ভক্তি, কর্মযোগ এবং জ্ঞানযোগাদি সাধনার দ্বারা জ্ঞান উৎপন্ন হয়ে তার আগুনে অনন্ত কর্মরাশি সম্পূর্ণরূপে ভস্ম হয়ে যায় ততক্ষণ পর্যন্ত জীবকে ফলভোগের জন্য পরবশ হয়ে শুভাশুভ কর্ম-সংস্কার মূল-প্রকৃতি এবং অন্তঃকরণ তথা ইন্দ্রিয়কে সঙ্গে নিয়ে ক্রমাগত আসা-যাওয়া করতে হয়। এই গমনাগমনে এই বস্তুগুলিই আসা-যাওয়া করে। জীবের পূর্বজন্মকৃত শুভাশুভ কর্মই এর গর্ভে আসার কারণ আর তার জন্মার্জিত কর্মের অংশ বিশেষের দ্বারা গঠিত ভাগ্যানুসারে তা ভোগ করার

জন্যই এর জন্ম। কর্ম হয় ভোগের দ্বারা বিনষ্ট হয়, নয়তো প্রায়শ্চিত্ত অথবা নিষ্কাম কর্ম-উপাসনা প্রভৃতি সাধনের দ্বারা বিনষ্ট হয়। এর সম্পূর্ণ বিনাশ তো কেবল পরমাত্মাকে লাভ করলেই হয়ে থাকে। যিনি নিষ্কামভাবে সদাসর্বদা পরমাত্মাকে স্মরণ করতে করতে মন বুদ্ধি পরমাত্মাকে অর্পণ করে সমস্ত কর্ম পরমাত্মার জন্যই করেন তাঁর অন্তকালের বাসনা কেবল পরমাত্মবিষয়েই হয়ে থাকে এবং সেই অনুসারেই তাঁর পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়। সেইজন্য ভগবান বলেছেন—

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ।
ময্যর্পিতমনোবুদ্ধির্মামেবৈষ্যস্যসংশয়ম্॥

(গীতা ৮।৭)

'হে অর্জুন! তুমি সব সময় নিরন্তর আমাকে স্মরণ কর এবং যুদ্ধও কর। এইভাবে আমাকে অর্পিত মন-বুদ্ধির দ্বারা যুক্ত হলে তুমি নিঃসন্দেহে আমাকেই লাভ করবে।'

অতএব তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত হওয়ার ফলে সেই ব্যক্তির অজ্ঞানসহ সকল কর্ম নাশ হয়ে যায়। এর ফলে তার গমনাগমন চিরকালের জন্য বন্ধ হয়ে যায়। এরই নাম মুক্তি, এরই নাম পরম পদের প্রাপ্তি, এইটিই জীবের পরম লক্ষ্য। এই মুক্তির দুটি ভাগ—এক, সদ্যোমুক্তি ; দুই, ক্রমমুক্তি। এগুলির মধ্যে ক্রমমুক্তির বর্ণনা তো দেবযানমার্গের প্রকরণে করা হয়েছে। সদ্যোমুক্তিও দুই প্রকারের—জীবন্মুক্তি এবং বিদেহমুক্তি।

তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়ে যাওয়ার পর জীবন্মুক্ত পুরুষকে লোকদৃষ্টিতে জীবিতাবস্থায় কর্মে প্রবৃত্ত বলে মনে হয়। কিন্তু বাস্তবে কর্মের সঙ্গে তার কোনো সম্বন্ধ থাকে না। যদি কেউ বলে যে সম্বন্ধ ছাড়া সে কীকরে কর্ম করে তবে তার উত্তর হল এই যে, বাস্তবে সে তো কোনো কর্মের কর্তা নয়, পূর্বজন্মের শুভাশুভকর্মের ফলে গঠিত ভাগ্যের শেষ ভাগটি অবশিষ্ট থাকে এবং সেটি ভোগ করার জন্য তারই বেগে, কুম্ভকার না থাকলেও কুম্ভকারের চক্রের মতো কর্তা না থাকলেও পরমেশ্বরের সত্তা-স্ফুর্তিতে পূর্বের

স্বভাবানুসারে কর্ম হতে থাকে। কিন্তু সেই কর্তৃত্ব-অহংকারশূন্য কর্ম কোনো পাপ-পুণ্য সৃষ্টিকারী না হওয়ায় বাস্তবে তাকে কর্ম বলে মনে করা হয় না (গীতা ১৮।১৭)।

অন্তিমকালে তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা তিনটি শরীরই অস্তিত্বহীন হয়ে গেলে যখন শুদ্ধ সচ্চিদানন্দঘনে তদ্রূপতা প্রাপ্ত হয় (গীতা ৫।১৭) তখন তাকে বিদেহমুক্তি বলে। যে মায়ার ফলে কোথাও না-গমনাগমনকারী নির্মল নির্গুণ সচ্চিদানন্দরূপ আত্মাতে ভুল করে গমনাগমনের ভাবনা মনে হয়, ভগবানের প্রতি ভক্তির দ্বারা সেই মায়া থেকে মুক্ত হয়ে এই পরমপদ প্রাপ্তির জন্য আমাদের সকলের যত্নশীল হওয়া উচিত।

আমি কে এবং আমার কর্তব্য কী ?

প্রত্যেক মানুষের চিন্তা করা উচিত 'আমি কে এবং আমার কী কর্তব্য ?' আমি নাম, রূপ—দেহ, ইন্দ্রিয়, মন বা বুদ্ধি, নাকি অন্য কিছু ? বিচারপূর্বক চিন্তা করলে বোঝা যায় যে আমি নাম নই। আজ আমাকে জয়দয়াল বলা হয়, কিন্তু যখন আমি জন্মেছিলাম সেই সময় আমার নাম জয়দয়াল ছিল না। আমি কিন্তু তখন হাজির ছিলাম। কিছুদিন পরে বাড়ির লোকেরা নামকরণ করে। সেইসময় তাঁরা যদি জয়দয়াল নাম না রেখে মহাদয়াল রাখতেন তাহলে আজ আমাকে মহাদয়াল বলা হতো আর আমিও নিজেকে মহাদয়াল বলেই মনে করতাম। আমি পূর্বজন্মে জয়দয়াল ছিলাম না, গর্ভের মধ্যেও জয়দয়াল ছিলাম না এবং শরীর বিনাশ হওয়ার পরও আমি জয়দয়াল থাকব না। এটি তো কেবল বাড়ির লোকেদের দ্বারা নির্দিষ্ট একটি সাঙ্কেতিক নাম। এই নাম এমন এক কল্পিত বস্তু যে যখন খুশী একে বদলান যায় আর তাতেই তার আত্মীকরণ হয়ে যায়। যে বিবেকবান ব্যক্তি এই রহস্যটি বুঝতে পারেন যে তিনি নাম নন, তিনি নামের নিন্দা-স্তুতিতে কখনোই সুখী-দুঃখী হন না।

যখন সেই ব্যক্তি 'নাম'-এর নিন্দা-স্তুতিতে সাম্যে থাকেন না, নিন্দা-স্তুতিতে সুখী-দুঃখী হন তখন তিনি নাম না হয়েও 'নাম'-এ আবিষ্ট হয়ে যান। এটি সম্পূর্ণ ভুল। এই রহস্যটিকে যিনি চিনে নেন তাঁর মধ্যে এই ভুলের গন্ধও থাকে না। এইজন্য ভগবান তত্ত্ববেত্তা ব্যক্তির লক্ষণসমূহ জানাবার সময় নিন্দা-স্তুতিতে তাঁর সাম্য অবস্থার কথা বলেছেন—

'তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী' (গীতা ১২।১৯)

'তুল্যনিন্দাত্মসংস্তুতিঃ' (গীতা ১৪।২৪)

তাছাড়া এটিও প্রমাণিত যে জয়দয়াল 'আমার' নাম, 'আমি' জয়দয়াল নই। তাহলে এটি সিদ্ধ হল যে নাম 'আমি' নই।

এইভাবে রূপ, দেহও আমি নই। কেননা দেহ হল জড় আর আমি চেতন। দেহ ক্ষয়, বৃদ্ধি, উৎপত্তি এবং বিনাশধর্মবিশিষ্ট। আমি এ থেকে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। শিশুকালে দেহের স্বরূপ ছিল অন্য রকম, যুবাবস্থায় আর এক রকম আর এখন তো অন্য আর এক রকম। কিন্তু আমি তিনটি অবস্থাকে জ্ঞাত তিনটিতে একই। কোনো লোক যিনি আমাকে শিশুকালে দেখেছেন এখন আমাকে দেখলে তিনি চিনতে পারবেন না। দেহের রূপ বদলে গিয়েছে। শরীর বড় হয়েছে, গোঁফ গজিয়েছে। সেইজন্য তিনি আমাকে চিনতে পারবেন না, কিন্তু আমি তাঁকে চিনতে পারি। আমি তাঁকে বলি আপনার শরীর যুবাবস্থা থেকে বৃদ্ধাবস্থাতে পরিণত হওয়ায় তাতে তফাত কমই হয়েছে। তাই আমি আপনাকে চিনতে পেরেছি। আমি আপনাকে অমুক জায়গায় দেখেছিলাম। সেই সময় আমি বালক ছিলাম। এখন আমার শরীরে অনেক পরিবর্তন হয়েছে। তাই আপনি আমাকে চিনতে পারেননি। এতেই প্রমাণিত হয় যে 'আমি' শরীর নই। কিন্তু 'শরীরই হলাম আমি' এমন ধারণাও পূর্বোক্ত নামের মতোই সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। যে ব্যক্তি এই রহস্যকে জানেন তিনি শরীরের মান-অপমান এবং সুখ-দুঃখে সব সময় সমান থাকেন। কেননা তিনি এটি বুঝে নিয়েছেন যে তিনি শরীর থেকে

সম্পূর্ণ পৃথক। এজন্য তত্ত্ববেত্তাদের লক্ষণসমূহে ভগবান বলেছেন—

'সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ।' (গীতা ১২।১৮)

'মানাপমানয়োস্তুল্যঃ' (গীতা ১৪।২৫)

'সমদুঃখসুখঃ স্বস্থঃ' (গীতা ১৪।২৪)

অতএব চিন্তা করলে এটি প্রত্যক্ষ প্রমাণিত হয় যে এই জড় শরীরও আমি নই, আমি শরীরের জ্ঞাতা আর এটি প্রসিদ্ধ যে 'শরীর' হল আমার। মানুষ ভুল করে শরীরে আত্মাভিমান করে তার মান-অপমান ও সুখ-দুঃখে সুখী এবং দুঃখিত হয়।

এইভাবে আমি ইন্দ্রিয়ও নই। হাত-পা কেটে গেলে, চোখ নষ্ট হয়ে গেলে এবং কান বধির হয়ে গেলেও আমি অন্যের মতো যেমনকার তেমন থাকি, মরে যাই না। আমি যদি ইন্দ্রিয় হতাম তাহলে সেগুলির বিনাশে আমারও বিনাশ হয়ে যেত। অতএব একটু চিন্তা করলেই বোঝা যায় যে আমি জড় ইন্দ্রিয় নই, বরং আমি হলাম ইন্দ্রিয়ের দ্রষ্টা অথবা জ্ঞাতা।

অনুরূপভাবে মনও আমি নই। সুষুপ্তির সময় মন থাকে না, কিন্তু আমি থাকি। এইজন্য জেগে ওঠার পর আমার এই বোধ থাকে যে আমি আরামে ঘুমিয়েছি। আমি হলাম মনের জ্ঞাতা। অন্যের দৃষ্টিতেও মনের অনুপস্থিতিকালে (সুষুপ্তি অথবা মূর্ছাবস্থায়) আমার জীবিত সত্তা প্রসিদ্ধ। মন হল বিকারযুক্ত, এতে নানা রকমের সঙ্কল্প-বিকল্প হতে থাকে। মনের এই সমস্ত সঙ্কল্প-বিকল্পের আমি হলাম জ্ঞাতা। খাওয়া-দাওয়া-স্নান প্রভৃতি করার সময় মন যদি অন্য দিকে চলে যায় তাহলে সেইসব কাজে কিছু ভুল হয়ে যায়। তারপর সচেতন হওয়ার পর আমি বলি যে আমার মন অন্য দিকে চলে গিয়েছিল, সেজন্য আমার এই ভুল হয়েছে, কেননা মন ছাড়া কেবল শরীর ও ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাবধানতাপূর্বক কাজ হতে পারে না। অতএব মন হল চঞ্চল ও সচল, কিন্তু আমি স্থির ও অচঞ্চল। মন যেখানেই থাকুক, যা কিছু সঙ্কল্প-বিকল্প করতে থাকুক আমি তাকে জানতে থাকি। অতএব আমি হলাম মনের জ্ঞাতা, মন নই।

এইভাবে আমি বুদ্ধিও নই। কেননা বুদ্ধিও ক্ষয় ও বৃদ্ধির স্বভাব বিশিষ্ট। আমি ক্ষয়-বৃদ্ধি থেকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত । বুদ্ধিতে মন্দতা, তীব্রতা, পবিত্রতা, মলিনতা প্রভৃতি বিকারও হয়। কিন্তু আমি এই সবগুলি থেকে মুক্ত এবং এইসব স্থিতিকে আমি জানি। আমি বলি যে সেসময় আমার বুদ্ধি ঠিক ছিল না, এখন ঠিক আছে। মন কখন কী বিচার করছে, কী নির্ণয় করছে তা আমি জানি। বুদ্ধি হল দৃশ্য, আমি হলাম দ্রষ্টা। অতএব বুদ্ধির সঙ্গে আমার পৃথকত্ব প্রমাণিত হল, আমি বুদ্ধি নই।

এইভাবে আমি নাম, রূপ, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি নই। আমি এই সব কিছুর অতীত, এইগুলি থেকে সম্পূর্ণ পৃথক, চেতন, সাক্ষী সব কিছুর জ্ঞাতা, সৎ, নিত্য, অবিনাশী, অবিকারী, অক্রিয়, সনাতন, অচল এবং সমস্ত সুখ-দুঃখ রহিত কেবল শুদ্ধ আনন্দময় আত্মা। এই-ই হলাম আমি। এইটিই আমার প্রকৃত পরিচয়। ক্লেশ[১], কর্ম এবং সকল দুঃখ থেকে মুক্ত হয়ে পরম শান্তি এবং পরমানন্দ প্রাপ্তির জন্য মনুষ্য-শরীর লব্ধ হয়েছে। এই পরম শান্তি এবং পরমানন্দ লাভ করাই মানুষের একমাত্র কর্তব্য। মনুষ্য-শরীর ছাড়া অন্য কোনো দেহে পরমানন্দের প্রাপ্তি সম্ভব নয়। এই অবস্থা লাভ করা তত্ত্বজ্ঞানে হয় আর সেই তত্ত্বজ্ঞান আসে বিবেক, বৈরাগ্য, বিচার, সদাচার, সৎগুণ প্রভৃতির পালনে। উপরন্তু এইসবগুলির চর্চা বর্তমান ঘোর কলিতে ঈশ্বরের দয়া ছাড়া সম্ভব নয়। যদিও ঈশ্বরের দয়া সমস্ত জীবের প্রতি পূর্ণরূপে সবসময়ে বর্তমান, তবু তাঁর শরণ না নিলে সেই দয়ার রহস্য মানুষ বুঝতে পারে না। আর দয়ার তত্ত্বকে বুঝতে না পারলে সেই দয়ার দ্বারা যে লাভ হতে পারে তা পাওয়া যায় না। অতএব তত্ত্বজ্ঞান প্রাপ্ত করবার জন্য সর্বপ্রকারে ঈশ্বরের শরণাগত হয়ে তাঁর দয়ার রহস্যকে হৃদয়ঙ্গম করে দয়ার পূর্ণ লাভ পেতে হবে। ঈশ্বরের শরণাগত হয়েই আমরা পরম শান্তি পেতে

---

[১]অবিদ্যাস্মিতারাগদ্বেষাভিনিবেশাঃ পঞ্চ ক্লেশাঃ (যোগবশিষ্ঠ ২।৩)। অজ্ঞান, চিজ্জড়গ্রন্থি, রাগ, দ্বেষ এবং মরণভয়—এই হল পাঁচটি ক্লেশ।

পারি। ভগবান বলেছেন—

তমেব শরণং গচ্ছ সর্বভাবেন ভারত।
তৎ প্রসাসাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥
(গীতা ১৮।৬২)

'হে ভারত ! সর্ব প্রকারে সেই পরমেশ্বরের অনন্য শরণ লাভ কর। সেই পরমাত্মার কৃপাতেই তুমি পরম শান্তি এবং সনাতন পরমধাম লাভ করবে।'

মানুষ যখন কেবল পরমেশ্বরের শরণাগত হয়ে[১] পরমেশ্বরের তত্ত্বকে জেনে নেয় তখন সেই পরমেশ্বরের কৃপায় অজ্ঞানতা দূর হয়ে পরমেশ্বরকে পেয়ে যায়। যেমন নিদ্রা দূর হলে মানুষ জাগৃতিকে, দর্পণ নষ্ট হয়ে গেলে প্রতিবিম্ব বিম্বকে আর ঘট ভেঙ্গে গেলে ঘটাকাশ মহাকাশকে পেয়ে যায় সেইরকমই অজ্ঞানতা দূর হলে এই জীবাত্মা বিজ্ঞানানন্দময় পরমাত্মাকে লাভ করে। সাধক যখন নাম, রূপ, দেহ, ইন্দ্রিয়, মন, বুদ্ধি প্রভৃতি থেকে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক বুঝে নেন তখন ঈশ্বরের শরণ ও কৃপায় দেহাদির সম্বন্ধ থেকে যেসব ক্লেশ ও পাপ হয় তা থেকে চিরকালের জন্য মুক্ত হয়ে যান। আর বিজ্ঞানানন্দময় পরমাত্মার সনাতন অংশ হওয়ার কারণে বিজ্ঞানানন্দময় প্রভুকে চিরকালের জন্য পেয়ে যান। প্রভুকে পাওয়ার জন্য অনন্যভাবে চেষ্টা করা এবং তাঁকে পাওয়া মানুষের পরম কর্তব্য।

—— ০ ——

[১]শরণাগতের সার কথা হল শ্রদ্ধা ও প্রেমপূর্বক নিষ্কামভাবে প্রভুর আজ্ঞা পালন করা, গুণ এবং প্রভাবসহ তাঁর স্বরূপের চিন্তা করা এবং আমাদের কর্মানুসারে ঈশ্বরের দেওয়া সুখ-দুঃখাদি বিধানে সম্পূর্ণরূপে সমচিত্ত থাকা।

সময়ের সদ্ব্যবহার

অমূল্য সময়ের রহস্য বুঝে নিয়ে মানুষের উচিত তার সমস্ত সময় ভগবানের প্রভাব এবং রহস্য অনুধাবন করে শ্রদ্ধা এবং প্রেমের সঙ্গে নিরন্তর কেবল ঈশ্বরের চিন্তায় নিয়োজিত থাকা। মানুষ যদি ভগবৎ-চিন্তার এই রকম অভ্যাস করে তাহলে সে অল্প সময়ের মধ্যেই পরমেশ্বরকে পেতে পারে। এই রকম অভ্যাসের ফলে সমস্ত দুর্গুণ, দুরাচার এবং দুঃখের পূর্ণ অবসান হয়ে যায় আর মানুষ অনায়াসে সদাচার ও সৎগুণসম্পন্ন হয়ে পরম শান্তি এবং পরম আনন্দ লাভ করে।

শাস্ত্রে বলা হয়েছে যে পৃথিবীতে চুরাশি লক্ষ যোনির অগণিত জীব আছে। এই সকলের মধ্যে একমাত্র মানুষেরই পরমাত্মাকে লাভ করবার অধিকার মানা হয়েছে। পরমাত্মার অসীম কৃপার প্রভাবে অনধিকারী পশু-পাখি তির্যক যোনিরাও পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে। এমন কথা ইতিহাসে পাওয়া যায়। কিন্তু তা হল ব্যতিক্রম, নিয়ম নয়। সমগ্র পৃথিবীতে যত জীব আছে তার সংখ্যা অনুমান করা বালখিল্য ব্যাপার, কিন্তু মানুষের সাধারণ বুদ্ধিতে একথা বলা যায় যে সমগ্র সৃষ্টির অনন্ত কোটি জীবের মধ্যে মানুষের সংখ্যা অগাধ সমুদ্রে একটি ছোট ঢেউ-এর মতো। যদি প্রত্যেক যোনিভোগান্তে ঠিক ক্রম অনুসরণ করে জীবকে মনুষ্যশরীর লাভ করতে হয় তাহলে তার পক্ষে তা পাওয়া অনেক যুগের পরেই সম্ভব। আচরণের দিকে দেখলেও নিরাশ হতে হয়, আচরণ তো এমনই যে তা থেকে তাড়াতাড়ি মনুষ্য-শরীর পাওয়ার আশা করা যায় না। যারা মনুষ্য-শরীর পেয়েছে তাদের প্রতি ঈশ্বরের মহান কৃপা মনে করা উচিত। এজন্য শ্রীরামচরিতমানসে বলা হয়েছে—

আকর চারি লচ্ছ চৌরাসী। জোনি ভ্রমত যহ জিব অবিনাসী॥
ফিরত সদা মায়া কর প্রেরা। কাল কর্ম সুভাব গুন ঘেরা॥
কবহুঁক করি করুনা নর দেহী। দেত ঈস বিনু হেতু সনেহী॥

অতএব বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের এটি মনে রাখা দরকার যে অনন্ত যুগ ধরে ভ্রাম্যমান অনন্ত কোটি জীবেদের মধ্যে যারা খুবই ভাগ্যবান এবং মুক্তির অধিকারী বলে বিবেচিত হন কেবল তাদেরই ঈশ্বর এমন দুর্লভ মুক্তিদায়ক মনুষ্য শরীর প্রদান করেন। এমন দুর্লভ এবং ক্ষণভঙ্গুর অনিত্য মনুষ্য-শরীর লাভ করে যে জীব তাড়াতাড়ি নিজের আত্মার কল্যাণের জন্য তৎপর হয় না তার মতো মূর্খ আর কেউ নেই। যখন মনুষ্য-শরীর প্রাপ্ত হল তখন এটি মনে রাখতে হবে যে আমরা সাধারণভাবে মুক্তির অধিকারী হয়ে গিয়েছি। তা যদি না হতো তাহলে মনুষ্য-শরীর আমাদের দেওয়া হল কেন ? দয়াময়ের অপার দয়াই আমাদের মুক্তির অধিকারী করেছে। এই অধিকার লাভ করেও যদি আমরা দয়াময়ের সেই দয়াকে অবহেলা করে নিজেদের সময়কে মিথ্যা ভোগ, প্রমাদ, পাপ এবং আলস্যে অতিবাহিত করি তাহলে তাকে মূঢ়তা ছাড়া আর কী বলা যায় ? আহার, নিদ্রা এবং মৈথুনাদি তো প্রায় সকল যোনির জীবের মধ্যেই হয়ে থাকে, কিন্তু মানুষের শরীর পেয়েও যদি জীব সেই বিষয়গুলিতে নিজেদের জীবন অতিবাহিত করে তাহলে সেরকম মানুষের সঙ্গে পশুর প্রভেদ কোথায় ? কুকুরীর সঙ্গে কুকুর যে সুখ পায় সেই সুখই রাজা রাণীর সঙ্গে এবং ইন্দ্র ইন্দ্রানীর সঙ্গে পেয়ে থাকেন। পুষ্পের সুকোমল শয্যায় ঘুমিয়ে বিলাসী মানুষ যে সুখ পায় সেই সুখ-ই গাধা ছাইয়ের উপর শুয়ে পেয়ে থাকে। নানা রকমের মিষ্টান্ন খেয়ে মানুষের যে আনন্দ হয় সেই আনন্দই কুকুর প্রভৃতি পশু-পাখি তাদের নিজেদের খাদ্য থেকে পেয়ে থাকে। ঈশ্বরের দয়ার ফলস্বরূপ দুর্লভ মনুষ্য-শরীর এবং এই রকম মানবীয় বুদ্ধি পেয়েও যদি আমরা এইসব পশু-পাখির মতো আহার, নিদ্রা এবং মৈথুনাদিকে সর্বোত্তম সুখ গণ্য করে তাতেই নিজেদের সময় অতিবাহিত করি তবে আমরা এই পশু-পাখিদের থেকেও অধম শ্রেণীর জীব হয়ে যাই। কেননা তাদের তো এইভাবে চিন্তা করবার এবং বিচার করবার বুদ্ধি নেই। সেজন্য তারা এতটা অপরাধী নয়। কিন্তু মনুষ্যত্বের অহংকার বিশিষ্ট প্রাণী যদি তাদেরই মতো আচরণ করে তাহলে তা তাদের

পক্ষে অত্যন্ত দুঃখ ও লজ্জার কথা।

মনে রাখতে হবে যে মানুষের আয়ু পরিমিত এবং তাও খুব কম। বর্তমান সময়ে সর্বাপেক্ষা একশ বছর আয়ু মানা হয়েছে, তাও আজকাল একশ জনের মধ্যে পাঁচ জনও পায় না। এই আয়ুরও অনেক বছর বাল্যাবস্থায় কেটে যায়। বৃদ্ধাবস্থায় সাধনা প্রায় করাই যায় না। যারা মনে করে যে বৃদ্ধাবস্থায় সাধনা করে নেবে তারা খুব ভুল করে। অবশিষ্ট সময়ও নানা রকমের বাধা-বিপত্তিতে পরিপূর্ণ। আমাদের পূর্বসঞ্চিত পাপ, বর্তমানের অসৎ সঙ্গ এবং বিষয়াসক্তির কারণে বাধা-বিপত্তি আসতেই থাকে। শরীরও সব সময় সুস্থ থাকে না। মানুষের বুদ্ধি এবং তার চিন্তাও সব সময় এক রকম থাকে না। অসৎ সঙ্গে বুদ্ধি ভ্রষ্ট হয় আর পৃথিবীতে অসৎ সঙ্গই বেশি হয়ে থাকে। অলস, ভোগী, ভ্রান্তিকারী, দুরাচারী, অহংকারী এবং নাস্তিক মানুষদের সঙ্গই হল অসৎসঙ্গ। তারপর জানা নেই যে মৃত্যু কখন হবে। এইরকম ঘোর বিপদ সকল থেকে নিজেকে রক্ষা করে এই স্বল্প সময়ের মধ্যে নিজের ধ্যেয় অর্জন করা সেই বুদ্ধিমান ব্যক্তির পক্ষেই সম্ভব যিনি সব দিক থেকে তাঁর মন সরিয়ে এনে অত্যন্ত তৎপরতার সঙ্গে লক্ষ্য অর্জনের জন্য সর্বতোভাবে তৎপর থাকেন। সেই প্রকৃত বুদ্ধিমান যে এমন অমূল্য সময়ের একটি মুহূর্তও আলস্য এবং প্রমাদে অতিবাহিত না করে সকল সময়ে নিজের লক্ষ্যে নিয়োজিত থাকে। মানুষকে তার আয়ুর প্রতিটি মুহূর্তকে খুবই সাবধানতার সঙ্গে সেইভাবে পরম প্রয়োজনীয় সাধনায় নিয়োজিত রাখতে হবে যেমনভাবে অত্যন্ত দরিদ্র এবং উপার্জনহীন কৃপণ মানুষ তার সীমিত অর্থ অত্যাবশ্যক জিনিসে ব্যয় করে। অমূল্য সময়ের রহস্যকে যে জানে সে কখনও বৃথা সময় ব্যয় করতে পারে না। অতএব আমাদের উচিত যে মৃত্যুর কাছাকাছি যাবার আগে এবং বৃদ্ধাবস্থায় পৌঁছবার আগেই তৎপরতার সঙ্গে চেষ্টা করে নিজের ধ্যেয় অর্জন করা। নইলে পরে খুবই অনুশোচনা করতে হবে।

সো পরত্র দুখ পাবই সির ধুনি ধুনি পছিতাই।

কালহি কর্মহি ঈশ্বরহি মিথ্যা দোস লগাই॥

এখন খুব ভাল সুযোগ। কেননা এই ঘোর কলিকালে নিষ্কামভাবে করা সামান্য ভগবৎজনরূপ সাধনকে কল্যাণকারী বলে মানা হয়েছে। তার উপর ঈশ্বরের দয়ার তো পার নেই। এতদ্ সত্ত্বেও যদি আমরা তাঁর দয়া, প্রেম এবং প্রভাবের রহস্য বুঝে নিয়ে তাঁকে ভজনা করবার জন্য কটিবদ্ধ না হই তাহলে কর্মের এবং সময়ের অজুহাত দেওয়া সম্পূর্ণ অসঙ্গত। অতএব ওঠো, সাবধান হও এবং মহর্ষিদের প্রদর্শিত পথে নিজের পরম সিদ্ধির জন্য কোমর বেঁধে চেষ্টা কর।

আজকের পর কাল এবং কালকের পর পরশু—এইভাবে যিনি আত্মোন্নতির পথে উত্তরোত্তর অগ্রসর হন তিনি বুদ্ধিমান। শ্রুতি, স্মৃতি, ইতিহাস এবং পুরাণাদি শাস্ত্রে উল্লিখিত কথাগুলির মধ্যে যেটিকে সর্বোত্তম বলে মনে করা হয় তারই চর্চায় নিজের সময় নিয়োজিত করা উচিত। সেই সঙ্গে নিজেদের দৃষ্টিতে যাঁকে শাস্ত্রানুমোদিত লক্ষণবিশিষ্ট মানুষ বলে মনে হবে তাঁর প্রদর্শিত পথে চলতে হবে। এই রকম মহাপুরুষদের উত্তম গুণ ও উত্তম আচরণ অনুকরণ করা উচিত। যদি ভাল মানুষের দেখা পাওয়া না যায় তাহলে আগে যেসব মহাপুরুষ ছিলেন তাঁদের জীবন-চরিত পড়ে তাঁদের গুণ এবং আচরণকে আদর্শ গণ্য করে তদনুসারে নিজেদের জীবনকে উত্তরোত্তর সর্বোৎকৃষ্ট করে যেতে হবে। যতদিন জীবন থাকবে ততদিন এগিয়ে যেতেই হবে। এমন কথা যেন কখনও মনে না আসে যে আমাদের উন্নতি চরম সীমায় পৌঁছিয়ে গিয়েছে আর কিছুর সম্ভাবনা নেই। এরকম মনে করা উন্নতির পথকে শুধু আটকে দেওয়াই নয় এই রকম মনে করায় অনেক মানুষ তাঁদের স্থিতি থেকে পতিত হয়েছেন।

মানবীয় বুদ্ধিরূপী গজে (মাপদণ্ডে) প্রকৃত উন্নতি মাপা যায় না। মাপবার এই গজ সেই সীমা পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। যেখানে সীমা শেষ হয়ে যায়, দেহাভিমানের সম্পূর্ণরূপে বিনাশ হয়ে যায় সেখানে তো এই কথা মেনে নেওয়ার বা বলবার কোনো ব্যক্তি থাকে না, যে বলবে যে তার আর কোনো

কর্তব্য নেই। আর যতক্ষণ দেহাভিমান থাকে অর্থাৎ যতক্ষণ দেহই 'আমি' ভাব অর্থাৎ যতক্ষণ দেহের সঙ্গে একাত্মভাব থাকে ততক্ষণ আমার কর্তব্যের অবসান হয়েছে এরূপ মনে করা খুবই ভুল। যতক্ষণ পর্যন্ত দেহে ব্যষ্টিভাবে নিজের ব্যবস্থা করবার, নিজের স্থিতি বোঝবার মতো পরিচ্ছিন্নভাব থাকে ততক্ষণ মানুষকে উত্তরোত্তর উন্নতির জন্য চেষ্টা করতে হবে। যে মানুষ পরমাত্মাকে তত্ত্বগতভাবে জেনে তাঁকে লাভ করেন তাঁর কোনো কর্তব্য বাধন না থাকলেও লোক-উদ্ধারের জন্য তাঁর দ্বারাও কর্ম হতে থাকে। অবশ্য তাঁর কর্মকে অকর্ম বলা হয়েছে।

যেসব মানুষ উন্নতি চান তাঁদের কর্তব্যের কখনও অবসান হয় না। সংসারে যারা নিষিদ্ধ কর্ম করে তাদের অপেক্ষা যারা নিষিদ্ধ কর্ম করে না তারা উত্তম। তাদের অপেক্ষাও উত্তম হল যারা ধন, পুত্র, মান, সম্মান অথবা স্বর্গাদির কামনায় উত্তম আচরণ এবং ঈশ্বরকে ভক্তি করে। তাদের চেয়েও উত্তম হলেন যাঁরা সদাচার পালন ও ঈশ্বরকে ভক্তি করবার সময় ভগবানের কাছ থেকে কিছুই চান না ; তবে পরে কখনও বিপদে পড়লে তা থেকে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন। এঁদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ হলেন তাঁরা যাঁরা আত্মোদ্ধারের অতিরিক্ত অন্য কোনো কিছুর জন্য কখনও ইচ্ছা পোষণ করেন না এবং তাঁরা হলেন অতিশ্রেষ্ঠ যাঁরা ঈশ্বরের তত্ত্বকে জেনে কোনো কারণ ছাড়াই স্বাভাবিকভাবে প্রেমপূর্বক ঈশ্বরের ভক্তি এবং সদাচার পালন করেন। আর যেসব মহাপুরুষ ঈশ্বরকে লাভ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে তো কিছু বলারই নেই। ঈশ্বর প্রাপ্ত ব্যক্তিদের মধ্যেও তাঁরাই সর্বোত্তম যাঁরা ঈশ্বরের দিক থেকে সংসারে সদাচার এবং ভক্তি প্রচার করবার জন্য আদেশ অথবা অধিকার লাভ করেছেন। ঈশ্বরের কাছ থেকে যিনি এই কাজের অধিকার নিয়ে আসেন তাঁকে কারক-পুরুষ এবং অংশাবতারও বলা হয়। আর দয়াময় ভগবান তো সর্বোত্তম এবং সকল উত্তমের আধার। যিনি জীবের উদ্ধারের জন্য স্বয়ং কখনও কখনও অবতীর্ণ হয়ে শাশ্বত ধর্ম ও পরম পবিত্র ভক্তির প্রচার করেন। অতএব

মানুষের উচিত হল সর্বোত্তম পুরুষকে নিজের আদর্শ এবং ধ্যেয় মেনে নিয়ে তাঁর আদেশ পালন করে নিজের জীবনকে উত্তরোত্তর উন্নত করাতে নিজের সময় নিয়োজিত করা। এতেই মানুষের বুদ্ধিমত্তা।

এই প্রকার সর্বোত্তম উন্নতির জন্য অর্থাৎ পরমাত্মাকে প্রাপ্তির জন্য শ্রদ্ধা ও প্রেম একান্ত আবশ্যক। প্রথমে শ্রদ্ধা হয়, তারপর হয় প্রেম। পরমেশ্বরই হলেন সর্বোত্তম শ্রদ্ধার পাত্র, দ্বিতীয়ত তাঁরাও শ্রদ্ধার পাত্র যাঁদের সঙ্গ প্রভাবে পরমেশ্বরের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা হয়, যিনি পরমেশ্বরকে লাভ করেছেন অথবা পরমেশ্বরকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করছেন। পরমেশ্বর, সাধু-সন্ত এবং তাঁদের কথা, আচরণ ও গুণের প্রতি যে দৃঢ় বিশ্বাস এবং উচ্চ চিন্তা তারই নাম শ্রদ্ধা। যেমন, কোনো একটি পাথরকে এক মহাপুরুষ পরশপাথর বলে জানলেন। এই রকম অবস্থায় মহাপুরুষের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি সেই পাথরটিকে তখনই পরশপাথর বলে মনে করবেন। অর্থাৎ আমাদের দেখা, শোনা এবং জানা কোনো জিনিসকে যদি মহাপুরুষ অন্য ধরণের জিনিস (আমাদের প্রত্যক্ষ অনুভূতির বিপরীত) বলে জানান তাহলে তাঁরা সে কথা বলা মাত্র আমরা আমাদের ধারণামতো জিনিসটিকে না দেখে তাঁদের ধারণার জিনিস বলেই প্রত্যক্ষ করি। এই হল সর্বোত্তম শ্রদ্ধা। জিনিসটি তো সেই মতে দৃষ্ট হয় না, কিন্তু শ্রদ্ধার কারণে বিশ্বাস করা হয়। এটি হল মধ্যম শ্রদ্ধা। আর মহাপুরুষদের জানানো কথায় বিশ্বাস করার চেষ্টা করা হলে সেটি হল নিম্নশ্রেণীর শ্রদ্ধা। মহাপুরুষদের প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা থাকা চাই। কিন্তু আজকাল তো সংসারে ভগবানকে পেয়েছেন এমন মহাপুরুষ খুবই কম। যদি বা কেউ থাকেন, তো তাঁর দেখা পাওয়া কঠিন আর দেখতে পেলেও তাঁকে চেনা খুবই মুস্কিল। দৈবযোগে যদি আমরা মহাপুরুষের দেখা পাই তাহলে ঈশ্বরের খুবই দয়া মনে করতে হবে। আর যদি দেখা না পাওয়া যায় তাহলে তাঁদের দেওয়া সদুপদেশ এবং তাঁদের জীবনের শুদ্ধ আচরণগুলিকে আদর্শ করে সেগুলির প্রতি শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে। এই পথের অনুগামী সাধকদের সঙ্গও খুবই সহায়ক। তাঁদের

প্রতিও যথোচিত শ্রদ্ধা পোষণ করতে হবে।

শ্রদ্ধা থেকে প্রেম নিজে নিজেই এসে যায়। ঈশ্বরের প্রতি ভালবাসা তো ঈশ্বরেরই হয়ে থাকে। কিন্তু ঈশ্বরকে পাওয়ার জন্য ঈশ্বর-প্রাপ্ত পুরুষদের প্রতি ভালবাসা, সাধক এবং শাস্ত্রের প্রতি ভালবাসাও প্রকারান্তরে ঈশ্বরের প্রতিই হয়ে থাকে। অবশ্য এই ভালবাসাকে স্বার্থশূন্য হতে হবে। স্বার্থশূন্য ভালবাসায় পরমাত্মাকে তাড়াতাড়ি পাওয়া যায়। নিজের প্রেমাস্পদের গুণ, স্বভাব, আচরণ, নাম এবং স্বরূপের শ্রবণ, পঠন এবং চিন্তন হওয়ামাত্র শরীরে রোমাঞ্চ, অশ্রুপাত, কম্পন, কণ্ঠরোধ, প্রফুল্লতা প্রভৃতি লক্ষণগুলি ভালবাসার বাইরের চিহ্ন। সংযোগবশত পরম প্রসন্নতা, পরমশান্তি এবং আত্মবিস্তৃতি প্রভৃতি এবং বিরহে পরম ব্যাকুলতা, অত্যন্ত অসহনশীলতা এবং নিরন্তর চিন্তন হল ভালবাসার ভিতরের চিহ্ন। প্রেমাস্পদের ধ্যানে পরম শান্তি এবং আনন্দ তথা ব্যবহারকালে তাঁর নাম, রূপ, গুণ এবং আচরণের সতত স্মরণ করা তথা সেগুলির আচরণ ভালবাসাকে বৃদ্ধি করে। এই সব কিছুর মূলে থাকে শ্রদ্ধা। এই শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা পরমেশ্বরের তত্ত্ব, রহস্য, প্রভাব এবং গুণের সম্পর্কে জ্ঞাত হলে উদ্ভাসিত হয়। অতএব এবারে আমাদের তত্ত্ব, রহস্য, গুণ ও প্রভাব সম্বন্ধে ভেবে দেখতে হবে। পরমাত্মার তত্ত্ব, রহস্য, প্রভাব এবং গুণের বিস্তার অনন্ত এবং সেটি খুবই নিগূঢ় বিষয়। এইজন্য এটিকে সূক্ষ্ম বুদ্ধির দ্বারা চিন্তা করা উচিত।

তত্ত্ব

যেমন জলের অণু, মেঘ, জল এবং বরফ সবই তত্ত্বগতভাবে জল, তেমনই অনির্বচনীয়, জ্ঞানস্বরূপ, প্রকাশস্বরূপ এবং মনোহর সাকার বিগ্রহ সব এক ভগবানই। আকাশ হল শুদ্ধ নির্মল। তাতে অণুরূপে জল বিদ্যমান। কিন্তু তাকে চোখেও দেখা যায় না এবং কোনো যন্ত্রেও তা দৃষ্ট হয় না। তবু তার অস্তিত্ব বিজ্ঞান-স্বীকৃত। সেই জলই যখন মেঘ রূপে আসে তখনও জলকে দেখা না গেলেও চিন্তা করলে বোঝা যায় যে মেঘে জল আছে এবং বাতাসের সংস্পর্শে তা বৃষ্টি হয়ে পড়তে থাকে। আর সেই জলই শীতল

হয়ে বরফ হয়ে যায়। এইভাবেই ব্রহ্ম অনির্বচনীয়, অলক্ষ্য, অচিন্ত্য এবং গুণাতীত। এর কোনো এক অংশে গুণের সম্বন্ধ প্রতীত হয়। অর্থাৎ অনন্ত ব্রহ্মের কোনও একটি অংশে সত্ত্ব-রজ-তম ত্রিগুণাত্মক প্রকৃতি (অব্যাকৃত মায়া) স্থিত আছে। ব্রহ্মের সেই অংশকে সগুণ ব্রহ্ম বলা হয়। এই মায়াবিশিষ্ট ব্রহ্মকে সগুণ নিরাকার ব্রহ্ম বলে বুঝতে হবে। অব্যাকৃত মায়া নিরাকার, কিন্তু তা গুণময়ী। এইজন্য তার সঙ্গে সম্বন্ধিত ব্রহ্মকে সগুণ নিরাকার বলে মনে করা হয়েছে। এই নিরাকার ব্রহ্মকে সৎ-চিৎ-আনন্দরূপে উপাসনা করা হয়। গুণাতীতের উপাসনা হয় না, কেননা গুণাতীত বস্তু কোনো কিছুর বিষয় হতে পারে না। কিন্তু গুণাতীতের ভাবকে লক্ষ্যে রেখে সগুণ-নিরাকারের উপাসনা করা যায়। তারই ফলরূপে গুণাতীত শুদ্ধ ব্রহ্মের প্রাপ্তি বলা হয়েছে। সেই বিজ্ঞানানন্দময় সর্বব্যাপী নিরাকার ব্রহ্মই নিজের ইচ্ছায় তেজোময় প্রকাশরূপে প্রকট হন। একে জ্যোর্তিময়ও বলা হয়। সূর্য, চন্দ্র প্রভৃতি সকল জ্যোতির প্রকাশক হওয়ার কারণে তাকে সকল জ্যোতির জ্যোতি বলা হয়েছে। সেই জ্যোতির্ময় ব্রহ্ম চতুর্ভুজরূপে মহাবিষ্ণুর আকারে দিব্য বিগ্রহ ধারণ করেন। সেই চতুর্ভুজ মহাবিষ্ণুকে সগুণ-সাকার ব্রহ্ম বলা হয়। সেই মহাবিষ্ণু ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং মহেশ্বররূপে সৃষ্টি, স্থিতি ও সংহারের কাজ করেন। যেমন, অণু, মেঘ, জল এবং বরফ তত্ত্বগতভাবে দেখলে কেবল জলই। এই সব কিছুকে নিয়ে জলের এক সমগ্র রূপ। তেমনই গুণাতীত, সগুণ-নিরাকার জ্যোতির্ময় এবং সগুণ-সাকার সবগুলিই হল সমগ্র ব্রহ্ম। এই সমগ্রকে যথোপযুক্তভাবে জানাই হল ভগবানকে তত্ত্বগতভাবে জানা। কিন্তু এই কথাটি মনে রাখতে হবে যে জল যেমন জড়, বিকারী এবং অনিত্য, ভগবান তেমন জড়, বিকারী এবং অনিত্য নন। সংসারে কোনো কিছুই তাঁর সঙ্গে তুলনীয় নয়। কেবল বোঝার জন্যই জলের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে।

মানুষ, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতির শরীর, বৃক্ষ, পাহাড়, বনস্পতি এবং সোনা, রূপা প্রভৃতি ধাতু আর ঘট-পটাদি সকল পার্থিব বস্তু এক

ক্ষিতিরই রূপান্তর। এইসব কিছুর উৎপত্তি মাটি থেকে হয় এবং অন্তিমে এগুলি মাটিতে গিয়ে শেষ হয়ে যায়। বিজ্ঞানের দ্বারা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে বর্তমান কালেও সব মাটি বলেই প্রমাণিত হয়। এই সব কিছুর নাম যেমন ধরিত্রী তেমনই নির্গুণ, সগুণ, সাকার প্রভৃতি সমগ্রের নামই হল পরমেশ্বর। যাঁরা সাকার সগুণ ব্রহ্মকে উপাসনা করে ব্রহ্মকে পরিচ্ছিন্ন মনে করে নির্গুণ-নিরাকার এবং সগুণ-নিরাকারবদীদের নিন্দা করেন তাঁরা ব্রহ্মারই নিন্দা করেন। এইভাবে যাঁরা নির্গুণ-নিরাকারের উপাসক তাঁরা যখন নির্গুণের ভিন্ন নিরাকার ও সাকাররূপ সগুণ ব্রহ্মকে তার থেকে আলাদা মনে করে নিন্দা করেন তাঁরাও সেই ব্রহ্মারই নিন্দা করেন। অতএব তাঁরা উভয়েই ব্রহ্মের তত্ত্বকে জানেন না। ভগবান তো বলেছেন যে সবকিছুই বাসুদেব—**'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'** (গীতা ৭।১৯)। ভগবানের শরণাগত হয়ে যে কোনো রূপের উপাসক শ্রদ্ধাশীল ব্যক্তি সেই সমগ্র ব্রহ্মকে উপলব্ধি করে তাঁকে পেয়ে যান। ভগবান বলেছেন—

জরামরণমোক্ষায় মামাশ্রিত্য যতন্তি যে।
তে ব্রহ্ম তদ্বিদুঃ কৃৎস্নমধ্যাত্মং কর্ম চাখিলম্॥
সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ।
প্রয়াণকালেঽপি চ মাং তে বিদুর্যুক্তচেতসঃ॥

(গীতা ৭।২৯-৩০)

'যে আমার শরণাগত হয়ে জরা ও মরণ থেকে বাঁচবার জন্য প্রযত্ন করে সেই ব্যক্তি সেই ব্রহ্মকে তথা সম্পূর্ণ অধ্যাত্মকে এবং সকল কর্মকে জানে। যে ব্যক্তি অধিভূত এবং অধিদৈবসহ এবং অধিযজ্ঞের সঙ্গে (সকলের আত্মরূপ) আমাকে জানে সেই যুক্তচিত্ত ব্যক্তি অন্তিম সময়ে আমাকেই জানে অর্থাৎ আমাকে পায়।'

রহস্য

ঈশ্বরের রহস্য অদ্ভুত এবং অলৌকিক। ঈশ্বরের কৃপাতেই সেটি অল্পস্বল্প জানা যেতে পারে। রহস্য বলা হয় গোপনে থাকা তত্ত্বকে। রহস্য

(মর্ম) সকলকে জানানো যায় না। যে কোনো মানুষই তার পুঁজির রহস্য জিজ্ঞাসা করলেও তার পরম বিশ্বাসী ও অন্তরঙ্গ প্রেমীকে ছাড়া আর কাউকে জানায় না। সাধু-মহাত্মারাও তাঁদের স্থিতির অবস্থা অধিকারী ছাড়া অন্য কাউকে জানান না। ভগবানও তাঁর অধিকারী প্রিয় ভক্তের নিকটেই নিজের রহস্য উন্মোচন করেন। গীতাতে ভগবান যেখানেই বলেছেন যে 'এটি হল রহস্যের বিষয়', 'এটি গোপনীয়', 'এটি গুহ্যতম' অথবা 'সর্বগুহ্যতম' সেখানেই তিনি এই কথাগুলি বলেছেন 'আমিই হলাম পরমাত্মা', 'আমিই সর্বশ্রেষ্ঠ, তুমি আমাকেই ভক্তি কর, আমারই শরণ নাও' ইত্যাদি। এইভাবে নিজের বাস্তবিক অবস্থা নিজের প্রিয়জনকে জানানোই হল আসল রহস্য উন্মোচন করা। যেমন ভগবান গীতার চতুর্থ অধ্যায়ের প্রথম থেকে চতুর্দশ শ্লোক পর্যন্ত এই রহস্যটি জানিয়েছেন যে 'আমি সাক্ষাৎ পরমাত্মা পৃথিবীর ভার লাঘব করতে, সাধুদের রক্ষা করতে এবং ধর্মকে স্থাপনা করতে লীলারূপে প্রকট হয়েছি।' গীতার ১৮ অধ্যায়ের ৬৪তম শ্লোকে 'আমি তোমাকে সর্বগুহ্যতম রহস্য বলছি' এমন কথা বলে পরবর্তী ৬৫-৬৬ তম শ্লোকে বলে দিয়েছেন 'আমিই হলাম ঈশ্বর, তুমি কেবল আমারই শরণাগত হও'।

এইভাবে উত্তঙ্ক মুনি যখন ভগবান শ্রীকৃষ্ণকে অভিশাপ দিতে চেয়েছিলেন তখন শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে নিজের রহস্য জানিয়ে বিরত করেছিলেন। সেখানে তিনি বলেছিলেন 'কখনো কখনো আমি অবতাররূপে প্রকট হই। আমিই সাক্ষাৎ পরমাত্মা, এই সময় মনুষ্য শরীরে শ্রীকৃষ্ণ নামে প্রকট হয়েছি। আপনি আমাকে জানেন না, তাই অভিশাপ দেওয়ার কথা বলছেন। আপনি অভিশাপ দেবেন না। আমার উপর আপনার অভিশাপের কোনো প্রভাব পড়বে না অথচ আপনি তপোভ্রষ্ট হয়ে যাবেন।' তারপরে উত্তঙ্ক প্রার্থনা জানালে তাঁকে নিজের বিশ্বরূপ দেখিয়ে আশ্বস্ত করেছিলেন। (মহাভারত, অশ্বমেধপর্ব অধ্যায় ৫৩-৫৪)।

এইভাবে অন্যান্য ভক্তদেরও ভগবান প্রয়োজনমতো তাঁর রহস্য

জানিয়েছেন। যে মানুষ গুরু, শাস্ত্র, সন্ত অথবা সৎসঙ্গ প্রভৃতি কোনো এক সাধনের দ্বারা ঈশ্বরের রহস্যকে অর্থাৎ লুকানো পরম তত্ত্বকে জেনে যায় সে আর কখনও মুহূর্তের জন্যও ভগবানকে ভুলতে পারে না। সে সদা-সর্বদা ঈশ্বরেরই ভজনা করে। সে জেনে যায় যে ঈশ্বরই হলেন সর্বোৎকৃষ্ট। সর্বোৎকৃষ্টকে ছেড়ে কোন্ বুদ্ধিমান নিকৃষ্টকে ভজনা করবে? একটি খনিতে সোনা, রূপা, লোহা, পাথর, কয়লা প্রভৃতি কয়েকটি জিনিস আছে। যার যে জিনিসটি ইচ্ছা সে সেখান থেকে সেই জিনিসটি বার করে নিতে পারে। খনন করার পরিশ্রম একই আর সময়ও সমান লাগে। এই রকম অবস্থায় কোন্ মূর্খ সোনা ছেড়ে দিয়ে পাথর-কয়লা প্রভৃতি বার করবে? সোনার তত্ত্ব জানে যে পুরুষ সে এক মিনিটের জন্যও অন্য চেষ্টা না করে সোনা বার করতে লেগে যাবে। ঈশ্বরের তত্ত্বও এই রকম। এই রহস্যের সঙ্গে পরিচিত মানুষ এটি বুঝে নেন যে ঈশ্বরের চেয়ে বড় আর কোনো বস্তু নেই। এজন্য তিনি সব কিছু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়ে কেবল ঈশ্বরের ভজনাতেই লেগে থাকেন। ভগবান নিজেই বলেছেন—

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥ (গীতা ১৫।১৯)

'হে অর্জুন! এই রকম তত্ত্ব থেকে যে জ্ঞানী পুরুষ আমাকে পুরুষোত্তম বলে মানেন সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ সকল প্রকারে সর্বদা আমাকে অর্থাৎ বাসুদেব পরমেশ্বরকে ভজনা করেন।'

বাস্তবে সমগ্র বিশ্বই হল পরমেশ্বরের স্বরূপ। কিন্তু লোকেরা এই রহস্যকে মানে না। তারই জন্য সংসারের নানা রূপ দেখে দেখে সুখী বা দুঃখিত হয়। একজন বহুরূপী ছিল। সে পুলিশের এক বড় অফিসারের সাজ করে বাজারে গিয়েছিল। একজন দোকানদারের মাল রাস্তার উপর পড়েছিল। বহুরূপীটি সেখানে গিয়ে দোকানদারকে কেন রাস্তা আটকে রেখেছে বলে ধমকাতে শুরু করে বলল যে, 'তোমার বিরুদ্ধে মামলা করা হবে'। দোকানদার ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাকে খোশামোদ করতে লাগল। বহুরূপীর ছদ্মবেশ সফল

হয়ে গেল। তখন সে নিজের আসল পরিচয় দিয়ে দোকানদারের কাছ থেকে পুরস্কার চাইল। দোকানদারও বহুরূপীর পরিচয় পেয়ে গিয়ে হাসতে লাগল। তার সমস্ত বৈকল্য মুহূর্তের মধ্যে হাসিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল। বহুরূপী তখনও অফিসারের বেশে ছিল, দোকানদার তার সেই রূপই দেখছিল। কিন্তু রহস্য উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ায় ভাবেতে বিরাট পার্থক্য এসে গিয়েছিল। এইভাবেই পরমেশ্বর নিজের যোগমায়ার দ্বারা বিশ্বরূপ ধারণ করে প্রতি মুহূর্তে ছদ্মবেশ পরিবর্তন করে চলেছেন। আর লোকেরা তাঁর রহস্য না জানায় ভয় পাচ্ছে এবং ব্যাকুল হচ্ছে। আমরা যদি ভগবানকে প্রত্যেক রূপে চিনে নিই তাহলে ভগবানের এই রহস্য আমাদের কাছে উদ্‌ঘাটিত হয়ে যায়। তখন আর ভয় অথবা ব্যাকুলতা থাকতে পারে না। বহুরূপী যেমন তার রহস্য উন্মোচন করে তেমনই ভগবানও যখন দয়া করে নিজের রহস্য উন্মোচন করেন তখন ভক্ত সেই মুহূর্তে নির্ভয় এবং সুখময় হয়ে যান। কেননা তখন তিনি সর্বত্র ও সর্ব সময় কেবল এক আনন্দরূপ ভগবানকেই দেখেন।

প্রভাব

সামর্থ্য, বিশেষ শক্তি এবং তেজকে প্রভাব বলে। ঈশ্বরের প্রভাব অপরিমেয়। এইজন্যই বলা হয় যে ঈশ্বর অসম্ভবকে সম্ভব করতে পারেন। সমগ্র সংসারের উদ্ধার প্রায় অসম্ভব। কিন্তু যদি ঈশ্বর চান তাহলে এক মুহূর্তেই তিনি তা করতে পারেন। কেননা তিনি হলেন অপরিমিত প্রভাবশালী ও সর্বশক্তিমান। তাঁর পূর্ণ প্রভাব, দেব, দানব এবং মহর্ষিরাও জানেন না। তিনি নিজেই নিজেকে জানেন। এক মুহূর্তের মধ্যেই তিনি সমগ্র সংসারকে সৃষ্টি এবং বিনাশ করতে পারেন। শ্রুতি, স্মৃতি, গীতা প্রভৃতি গ্রন্থ তাঁর প্রভাবের বর্ণনায় পরিপূর্ণ। সমস্ত শক্তি তাঁর শক্তিরই এক অংশ। গীতায় ভগবান বলেছেন—

যদ্যদ্বিভূতিমৎ সত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তোজোঽংশসংভবম্॥

অথবা বহুনৈতেন কিং জ্ঞাতেন তবার্জুন।
বিষ্টভ্যাহমিদং কৃৎস্নমেকাংশেন স্থিতো জগৎ॥

(১০।৪১-৪২)

'তুমি জেনে রাখ যে আমার যত বিভূতিযুক্ত অর্থাৎ ঐশ্বর্যযুক্ত, কান্তিযুক্ত এবং শক্তিযুক্ত বস্তু আছে সেগুলি সবই আমার তেজের অংশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। অথবা হে অর্জুন ! এই অনেক কিছু জানায় তোমার কী প্রয়োজন ? আমি এই সমগ্র জগৎকে (নিজের যোগমায়ার) এক অংশ মাত্রে ধারণ করে স্থিত রয়েছি।'

যে মূঢ়তাবশতঃ কোনো বিশেষ শক্তিকে নিজের বলে মনে করে নেয় সে পতিত হয়। একবার ইন্দ্র, অগ্নি এবং বায়ু নামক দেবতারা অসুরদের উপর বিজয় লাভ করে নিজেদের শক্তির গর্ব করেছিলেন। সেজন্য তাঁদের যক্ষরূপ ব্রহ্মার কাছে লজ্জিত হতে হয়েছিল। এই কথা কেন উপনিষদে লেখা আছে।

ভগবানের প্রকৃত প্রভাব ভগবানের শরণাগত হলে তাঁর কৃপাতেই জানা যেতে পারে। এইজন্য আমাদের সকলের ভগবানের শরণ নেওয়া উচিত।

গুণ

পরমেশ্বর গুণাতীত এবং সর্বগুণসম্পন্ন। তাঁর গুণ অনন্ত, অসীম ; শেষ (অনন্তনাগ), শারদাও তাঁর গুণের বর্ণনা করতে অক্ষম। আমার মতো সাধারণ মানুষ কতটা আর বর্ণনা করতে পারে ! কথায় অনেক গুণের বর্ণনা করা হল অনন্ত ধনরাশির মালিককে লাখপতি বলা অথবা সূর্যের সঙ্গে জোনাকির ঝাঁককে তুলনা করা। সেই অনন্ত গুণসাগর প্রভুর একটি গুণকেও ভালভাবে বোঝা এবং বোঝানো খুবই কঠিন কাজ। তাহলে সকল গুণের বর্ণনা কী করে হতে পারে ? তাহলেও শাস্ত্রের আধারে কিছু লেখা যায়।

ভগবান হলেন পরম প্রেমময় । সমগ্র পৃথিবীর প্রেমকে যদি এক জায়গায় একত্র করা হয় তাহলেও তা প্রেমময় প্রভুর প্রেমসাগরের এক ফোঁটাও বোধহয় হবে না।

ভগবানের প্রকাশ অলৌকিক। কোটি কোটি সূর্য একত্র হলেও তাদের প্রকাশ (কিরণ) ভগবানের প্রকাশের সমান হবে না। একটি সূর্য সমগ্র পৃথিবীকে আলোকিত করে। তেমনই অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের অনন্ত কোটি সূর্যকে উদ্ভাসিতকারী সেই ঈশ্বরের প্রকাশকে বোঝাবার চেষ্টা করা হল যেন জোনাকির আলোকের দ্বারা সূর্যের আলোককে বোঝাবার চেষ্টা করা।

সর্বজ্ঞ পরমাত্মার জ্ঞানের কথাই তো এক অনুপম বিষয়। তিনি তো জ্ঞানরূপই। পৃথিবীর সকল জীবের জ্ঞানকে একত্র করলেও তাকে পরমাত্মার জ্ঞানের এক ক্ষুদ্র পরমাণুর আভাস বললেও অত্যুক্তি হবে না।

ভগবানের উদারতার কথা আর কী বলা যাবে। বিষ প্রদানকারী পূতনাকেও যিনি পরমগতি দিয়েছিলেন তাঁর ঔদার্যের আন্দাজ কী করে করা যায়।

অভয় তো ভগবানেরই স্বরূপ। যে প্রভুর রহস্য ও প্রভাবকে কেবল জানলেই অথবা যাঁর নাম স্মরণ মাত্রেই মানুষ চিরকালের জন্য অভয় হয়ে যায় সেই অভয়রূপ ভগবানের অভয়-রূপের কথা কী করে বোঝান যাবে ?

তিনি তো দয়ার সাগর। অত্যন্ত পাপী জীবও যদি তাঁর শরণ নেয় তাহলে তিনি তাকে চিরকালের জন্য পাপমুক্ত করে নিজের অভয়পদ দান করেন। যাকে কেউ আপনার করে নেয় না, শরণাগত হলে তাকেও প্রভু নিজের করে নেন।

ভগবানের পবিত্রতার কে অনুমান করবে ? তাঁর নাম-জপ, গুণ-গান এবং স্বরূপ চিন্তা করলে মহাপাপী ব্যক্তিও পরম পবিত্র হয়ে যায়। সেজন্য পিতামহ ভীষ্ম **'পবিত্রাণাং পবিত্রং যো মঙ্গলানাং চ মঙ্গলম্'** বলেছেন। সেই ভগবানের পবিত্রতার স্বরূপ কেমন করে বলা যাবে ?

ভগবান মহান ব্রহ্মচারী। যে ভক্ত তাঁকে চিন্তা করেন কামদেব তো তাঁর কাছেই ঘেঁসতে পারেন না। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ রূপে প্রকট হয়ে

গোপবালিকাদের সঙ্গে নির্দোষ কাম-গন্ধ-শূন্য রাসক্রীড়া করে তাদের দ্বারা কামদেবের কামের দম্ভ চূর্ণ করিয়েছিলেন। যাঁর ধ্যানে এবং চিন্তনে মানুষ ব্রহ্মচারী হয়ে যায় সেই মহান ব্রহ্মচারীর ব্রহ্মচর্যের মহিমা কে গাইতে পারে ?

ভগবান ক্ষমার প্রতিমূর্তি। ভৃগু বিনা কারণে তাঁর বুকে লাথি মেরেছিলেন। সেদিকে কোনো দৃষ্টি না দিয়ে তিনি তাঁর পা টিপে দিতে দিতে বলেছিলেন 'আমার বক্ষস্থল শক্ত, আপনার ব্যথা লাগেনি তো'। আর সেই লাথির চিহ্নকে ভূষণ রূপে সর্বদা ধারণ করে নিয়েছিলেন। লোক-ভর্তি সভায় গালাগাল করা শিশুপালের একশত অপরাধ ক্ষমা করে তাকে তিনি মুক্তি দিয়েছিলেন।

ভগবানের স্বভাবই তো অদ্বেষ্টা। তাঁর মধ্যে দ্বেষের গন্ধও নেই। যারা দ্বেষ করে তাদের তিনি দণ্ড দিয়ে উদ্ধার করে দেন। ভগবানের তো কথাই নেই, ভগবানের ভক্তদেরও স্বাভাবিক ধর্ম হল অপকারকারীর উপকার করা।

সত্য তো ভগবানেরই স্বরূপ। সমগ্র পৃথিবীতে যে সত্তা প্রতীত হয় তার তিনিই হলেন অধিষ্ঠান। সূর্য, চন্দ্র, সমুদ্র, পৃথিবী প্রভৃতি সব কিছু যে সত্যের আধারে স্থিত আছে সেই সত্য ভগবানেরই স্বরূপ। সমগ্র সংসার সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মার সত্যের আধারে স্থিত।

ভগবান পরম বৈরাগী। গুণময় সমগ্র পৃথিবীকে ধারণ করেও তিনি সম্পূর্ণরূপে গুণাতীত। সমগ্র সংসার যাঁর আত্মজন, তিনি সেই সকলের ভরণ-পোষণকারী বহুকুটুম্ব হয়েও কারও প্রতি আসক্ত নন, সব সময় সকলের কাছ থেকে নির্লিপ্ত।

ভগবান খুবই অমানী (বিনয়ী)। সকল লোকের পরম माननीয় হয়েও নিজে সম্পূর্ণরূপে অমানী এবং সকলকে মান দেন। এইজন্যই তাঁর নাম হয়েছে—**'অমানী মানদঃ'**।

তাঁর দানশীলতা তো অনুপম। তাঁর উপমা কল্পবৃক্ষের সঙ্গেও করা যায় না। কেননা কল্পবৃক্ষ তো যা চাওয়া হয় ভাল-মন্দ তাই দিয়ে দেয়, হিতাহিত দেখে না। কিন্তু ভগবান এমনই যে খারাপ জিনিস চাইলেও তিনি তা দেন না। নারদকে বিবাহ করতে দেননি। আর ঠিক মনে করলে যে কম চায় তাকেও অনেক দিয়ে দেন। যেমন ধ্রুব রাজ্য চেয়েছিল, তাকে তিনি মুক্তিও দিয়েছিলেন।

শান্তি এবং আনন্দ তো ভগবানের স্বরূপ। তাঁর শরণ নিলে মানুষ পরম শান্তি ও পরম আনন্দ লাভ করে। কার সঙ্গে তাঁর শান্তি এবং আনন্দের উপমা দেওয়া যাবে ?

ভগবানের গুণ অনন্ত এবং অপরিমেয়। শ্রীপুষ্পদন্তাচার্য বলেছেন—

অসিতগিরিসমং স্যাৎ কজ্জলং সিন্ধুপাত্রে
সুরতরুবরশাখা লেখনী পত্রমুর্বী।
লিখতি যদি গৃহীত্বা শারদা সর্বকালং
তদপি তব গুণানামীশ পারং ন যাতি॥

'হে পরমেশ্বর ! যদি সমুদ্রকে মস্যাধার করে তাতে কজ্জলগিরির কালি তৈরী করা হয় আর কল্পবৃক্ষের শাখাকে কলম করে তার দ্বারা পৃথিবীরূপে কাগজে স্বয়ং সরস্বতী দেবী সর্বদা আপনার গুণাবলী লিখতে থাকেন তাহলেও আপনার গুণের পার তিনি পেতে পারেন না।'

উপরের সব কথাগুলি বুঝে নিয়ে মানুষের উচিত হল সকল প্রকারে নিত্য-নিরন্তর পরমাত্মার শরণ নিয়ে নিজের অমূল্য সময়ের সদ্ব্যবহার করা। জীবনের একটি মুহূর্তও যেন বৃথা অতিবাহিত করা না হয়। ব্যস, এইটিই হল সময়ের সদ্ব্যবহার।

—— ০ ——

সতর্কবাণী

শাস্ত্র এবং মহাপুরুষগণ সর্বসমক্ষে উদাত্তস্বরে সতর্কবাণী দিয়ে এসেছেন এবং দিয়ে চলেছেন। তবু আমাদের ভাইদের তাতে চোখ খুলছে না। এটি খুবই আশ্চর্যের কথা। মনুষ্যদেহ অন্য সমস্ত প্রাণী অপেক্ষা উত্তম এবং মুক্তিদায়ী হওয়ার কারণে তাকে অমূল্য বলে মনে করা হয়েছে। চুরাশি লক্ষ যোনির মধ্যে মনুষ্যযোনি, সমস্ত দেশের মধ্যে ভারতভূমি এবং সকল ধর্মের মধ্যে বৈদিক সনাতন ধর্মকে সর্বোত্তম বলা হয়ে থাকে। মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ কোনো যোনি দেখাও যায় না। অধ্যাত্ম বিষয়ে ধার্মিক শিক্ষা সমগ্র পৃথিবীতে ভারতবর্ষ থেকেই প্রসারিত হয়েছে অর্থাৎ পৃথিবীতে যত প্রধান প্রধান ধর্ম প্রচারক হয়েছেন তাঁর প্রায় সকলেই ধর্ম বিষয়ক শিক্ষা ভারতবর্ষ থেকেই গ্রহণ করেছেন। আর এই বৈদিক ধর্ম অনাদি এবং সনাতন, সকল মত-মতান্তর ও ধর্মের উৎপত্তি এর পরে এবং এর আধারেই হয়েছে। বিধর্মী লোকেরাও এই বৈদিক ধর্মকে অনাদি বলে না মানলেও সর্বপ্রথম বলে মানে। অতএব যুক্তিতেও এই সব কিছু সর্বশ্রেষ্ঠ বলে প্রমাণিত হয়। এমন উত্তম দেশ, জাতি ও ধর্মকে লাভ করেও যারা উদ্দীপ্ত হয় না তাদের খুবই অনুশোচনা করতে হবে।

সো পরত্র দুখ পাবই সির ধুনি ধুনি পছিতাই।
কালহি কর্মহি ঈশ্বরহি মিথ্যা দোস লগাই॥

'ওইসব লোক মৃত্যুকে কাছে আসতে দেখে মাথা ঠুকে অনুশোচনা করবে এবং বলবে যে কলিকালের প্রভাবের জন্য তারা কল্যাণের নিমিত্ত কিছুই করতে পারেনি, তাদের ভাগ্যে এমন কথাই লেখা ছিল ও ঈশ্বরের ইচ্ছাও এমনই ছিল।' কিন্তু এসব কথা বলা ভুল। কারণ এই কলিকাল পাপের ভাণ্ডার হওয়া সত্ত্বেও আত্মোদ্ধারের পক্ষে পরম সহায়ক।'

কলির্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ।
কীর্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ১২।৩।৫১)

'হে রাজন্ ! দোষের ভাণ্ডার কলিযুগে এইটিই একটি বড় গুণ যে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের কীর্তনেই আসক্তিরহিত হয়ে মানুষ পরমাত্মাকে লাভ করতে পারে।'

কেবল ভগবানের গুণগান করলেই মানুষ পরমপদ লাভ করে। আত্মোদ্ধারের সাধনায় ভাগ্যও বাধক হয় না। এই জন্য ভাগ্যকে দোষ দেওয়া বৃথা আর ঈশ্বরের দয়া তো অপার—

আকর চারি লচ্ছ চৌরাসী। জোনি ভ্রমত য়হ জিব অবিনাসী॥
ফিরত সদা মায়া কর প্রেরা। কাল কর্ম সুভাব গুন ঘেরা॥
কবহুঁক করি করুনা নর দেহী। দেত ঈস বিনু হেতু সনেহী॥

এর পরেও ঈশ্বরকে দোষ দেওয়া মূর্খতা নয় তো কী ? আজ যদি আমরা কর্ম অনুসারে বাঁদর হতাম তাহলে গাছের উপর ইতস্তত লাফালাফি করতাম, পাখি হলে বনে জঙ্গলে আর শূকর হলে গ্রামে এদিকে ওদিকে ছোটাছুটি করতে হত। এছাড়া আর কীই বা করতে পারতাম ? একটু ভেবে দেখুন—পরম দয়ালু ঈশ্বরের কত বড় দয়া। ঈশ্বর এই মনুষ্য শরীর দিয়ে আমাদের কতই না বিশেষ সুযোগ করে দিয়েছেন। এমন সুযোগ পেয়ে আমাদের লক্ষ্যভ্রষ্ট হওয়া উচিত নয়। এর আগেও ঈশ্বর আমাদের কয়েকবার সুযোগ দিয়েছিলেন। কিন্তু আমরা সচেতন হইনি। তবুও তিনি আবার সুযোগ দিয়েছেন। এই রকম সুযোগ পেয়ে আমাদের সচেতন হওয়া উচিত। কেননা বিরাট ঐশ্বর্যশালী মান্ধাতা এবং যুধিষ্ঠিরের মতো ধর্মাত্মা চক্রবর্তী সম্রাট, হিরণ্যকশিপুর মতোই দীর্ঘ আয়ু বিশিষ্ট রাবণ এবং কুম্ভকর্ণের মতো বলশালী এবং প্রতাপী দৈত্য, বরুণ, কুবের এবং যমরাজের মতো লোকপাল ও ইন্দ্রের মতো দেবতাদের রাজাও জন্মগ্রহণ করার পর নিজেদের শরীর ও ঐশ্বর্যকে এখানেই ত্যাগ করে চলে গিয়েছেন। কারও সাথে কোনো কিছু যায়নি। তাহলে চিন্তা করতে হবে যে এই শরীর, ধন-সম্পদ, আত্মীয় স্বজন এবং ঐশ্বর্য প্রভৃতির সঙ্গে আমাদের মতো স্বল্প আয়ুর লোকেদের সম্বন্ধ কতটুকু !

তবু আপনারা মাতালের মতো এইসব কথা ভুলে গিয়ে দুঃখরূপ সংসারের অনিত্য বিষয়ভোগে এবং ধনসংগ্রহে আর আত্মজন ও নিজেদের শরীর পালনেই কেন নিজেদের অমূল্য মানবজীবনকে ধূলায় মিলিয়ে দিচ্ছেন ? এইসবের সঙ্গে আপনাদের আগে কোনো সম্পর্ক ছিল না আর ভবিষ্যতেও তা থাকবে না। তাহলে এই ক্ষণস্থায়ী বস্তুর উন্নতিতে নিজেদের উন্নতির পরাকাষ্ঠা বলে কেন মেনে নিয়েছেন ? এই জীবন ক্ষণস্থায়ী আর মৃত্যু আমাদের পথের দিকে চেয়ে আছে। কোনো খবর না দিয়ে হঠাৎই চলে আসবে। অতএব যতক্ষণ পর্যন্ত এই দেহে প্রাণ আছে, বৃদ্ধাবস্থা দূরে আছে, এর উপর নিজেদের অধিকার আছে ততক্ষণ যে কাজের জন্য এসেছেন সেই কর্তব্যকে শীঘ্রাতিশীঘ্র সম্পূর্ণ করুন। ভর্তৃহরি বলেছেন—

যাবৎ স্বস্থমিদং কলেবরগৃহং যাবচ্চ দূরে জরা
যাবচ্চেন্দ্রিয়শক্তিরপ্রতিহতা যাবৎ ক্ষয়ো নায়ুষঃ।
আত্মশ্রেয়সি তাবদেব বিদুষা কার্যঃ প্রযত্নো মহান্
প্রোদ্দীপ্তে ভবনে চ কূপখননং প্রত্যুদ্যমঃ কীদৃশঃ॥

(৩।৭৫)

'যতক্ষণ পর্যন্ত এই শরীররূপী গৃহ সুস্থ আছে, বৃদ্ধাবস্থা দূরে রয়েছে, ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি ক্ষীণ হয়নি এবং আয়ুরও (বিশেষ) ক্ষয় হয়নি ততক্ষণ বিদ্বান পুরুষের উচিত নিজের কল্যাণের জন্য প্রয়াস করে যাওয়া। তা নইলে বাড়িতে আগুন লেগে যাওয়ার পর কূয়া খননের চেষ্টা করে কী হবে ?'

অতএব—

কাল ভজংতা আজ ভজ, আজ ভজংতা অব।
পলমেঁ পরলয় হোয়গী, বহুরি ভজৈগা কব॥

আমাদের কাছে সেইটিই পরম কর্তব্য যার সম্পাদন আজ পর্যন্ত করা হয়নি। এই কর্তব্য পালন যদি আগে করা হোত তাহলে আমাদের এই দশা হোত না। পৃথিবীতে এমন কোনো যোনি নেই যা আমরা পাইনি। পিঁপড়া থেকে আরম্ভ করে দেবরাজ ইন্দ্রের যোনি পর্যন্ত আমরা ভোগ করে এসেছি।

কিন্তু সাধনা না করায় আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি। আর যতদিন না তৎপর হয়ে কল্যাণের জন্য সাধনা করছি ততদিন আমরা এইভাবে ঘুরতেই থাকব। লক্ষ-হাজার ব্রহ্মা, ইন্দ্র হয়েছেন আবার চলে গিয়েছেন আর আমাদের এত বেশি জন্ম হয়েছে যে পৃথিবীর ধূলিকণা গোণা গেলেও তার সংখ্যা গোণা যাবে না। আরও লক্ষ-কোটি কল্প অতিবাহিত হলেও সাধনা ছাড়া পরমাত্মাকে পাওয়া যায় না আর পরমাত্মাকে না পেলে ইতস্তত ছোটাছুটিও বন্ধ হতে পারে না। এইজন্য সেই সর্বব্যাপী পরম দয়ালু পরমাত্মার নাম এবং তাঁর রূপ সব সময় স্মরণ করা উচিত এবং তাঁর আদেশ পালন করা উচিত। এর ফলেই পরমাত্মাকে পাওয়া শীঘ্র ও সুলভ হয়ে যায় (গীতা ৮।১৪, ১২।৬-৭)। এই সাধনার জন্য সেই মহাপুরুষদের শরণ নেওয়া উচিত যাঁরা পরমাত্মাকে লাভ করেছেন। সেই মানুষদের সঙ্গ, সেবা এবং দয়াতেই ভগবানের গুণ এবং প্রভাব জেনে ভগবানের প্রতি পরম শ্রদ্ধা-প্রেমের দ্বারা ভগবৎ-প্রাপ্তি ঘটে। আর যে মানুষদের উপর প্রভুর দয়া হয় তাঁদের প্রতিই মহাপুরুষদেরও দয়া হয়ে থাকে। কেননা—

জাপর কৃপা রাম কী হোঈ। তাপর কৃপা করৈ সব কোঈ ॥

প্রভুর দয়াতে মহাপুরুষদের সঙ্গলাভের ও তাঁদের সেবা করার সুযোগ পাওয়া যায়। যদিও সকলের প্রতিই প্রভুর অপার দয়া আছে তবু আমরা আমাদের অজ্ঞানতার জন্য তা বুঝতে পারি না, বিষয়-সুখে মগ্ন থাকি। এজন্য আমরা সেই দয়ার সম্পূর্ণ লাভ নিতে পারি না। যেমন, কারও কাছে পরশ পাথর আছে, কিন্তু সে তার গুণ, প্রভাব এবং রহস্য সম্পর্কে অবহিত না হওয়ায় দারিদ্র্যের দুঃখ ভোগ করে। তেমনই আমরা ভগবান এবং ভগবানের দয়ার রহস্য, প্রভাব, তত্ত্ব ও গুণগুলি না জানায় দুঃখী হয়ে আছি।

অতএব এই সব জানার জন্য মহাপুরুষদের সঙ্গ, সেবা তথা প্রভুর নাম, রূপ, গুণ এবং চারিত্র্য-গ্রন্থ পাঠ করে তার কীর্তন ও মনন করা উচিত। কেননা নিয়ম হল এই যে কোনো জিনিসের গুণ এবং প্রভাব জানলে তার

প্রতি শ্রদ্ধা-ভালবাসা জাগে আর তার দোষ জানলে তার প্রতি ঘৃণা জন্মায়। আর এই কথাও প্রসিদ্ধ যে পরমেশ্বরের সমান না কোনো গুণী আছে, না আছে কোনো প্রভাবশালী। তাঁর সংকল্পের দ্বারা এবং চোখ খোলা ও বন্ধ করার মুহূর্তে সংসারের সৃষ্টি ও বিনাশ হয়ে যায়। তাঁর প্রভাবে মুহূর্তে মশার মতো জীব ইন্দ্রের মতো বড়ো আর ইন্দ্রের মতো জীব মশায় পরিণত হতে পারে। শুধু তাই নয় , তিনি অসম্ভবকে সম্ভব এবং সম্ভবকে অসম্ভব করতে পারেন। এমন কোনো কিছু নেই যা তাঁর প্রভাবে হতে পারে না। এমন প্রভাবশালী হলেও তিনি কখনও ভজনাকারীকে উপেক্ষা করেন না ; বরং তিনি নিজেই ভজনাকারীকে সেইভাবে ভজনা করেন। এই রহস্যের সামান্য কিছু যে মানুষ জানে সে এক মুহূর্তের জন্যও প্রভুর বিরহ কীকরে সহ্য করতে পারে ?

পরমেশ্বর মহাপাপী দীন-দুঃখী অনাথকে তার যাজ্ঞার কারণে তার দুর্গুণ ও দুরাচারের প্রতি খেয়াল না রেখে মা যেমন শিশুকে কোলে নিয়ে আদর করেন তেমনভাবে তাকে কাছে টেনে নেন। তাহলে সেই পরম দয়ালু প্রকৃত হিতৈষী পরম পুরুষের এই দয়ার তত্ত্বকে যারা জানেন তাঁরা তাঁকে না পেয়ে কীকরে থাকতে পারেন ?

সেই পরমাত্মায় ধৈর্য, ক্ষমা, দয়া, ত্যাগ, শান্তি, প্রেম, জ্ঞান, সমতা, নির্ভয়তা, বাৎসল্য, সারল্য, কোমলতা, মধুরতা সহৃদয়তা প্রভৃতি গুণের কোনো সীমা নেই এবং পরমাত্মার এই সব গুণ তাঁর ভজনাকারীর মধ্যে স্বাভাবিকভাবেই সঞ্চারিত হয়। এই কথার মর্ম যেসব মানুষ জানেন তাঁরা এক মহূর্তের জন্যেও তাঁকে ছেড়ে অন্যকে ভজনা করতে পারেন না।

যিনি প্রেমের তত্ত্ব জানেন, যিনি সাক্ষাৎ প্রেমস্বরূপ, যিনি মহান হয়ে নিজের প্রেমিক ভক্ত এবং সখাদের অনুগমন করেন সেই নিরভিমানী, প্রেমী, দয়ালু ভগবানের তত্ত্বের জ্ঞাতা ব্যক্তি তাঁর আদেশ কী করে লঙ্ঘন করবে ?

ভগবানের এই সকল গুণ ও প্রভাব জেনে গেলে তো কোনো কথাই

নেই বরং এমন গুণ ও প্রভাব সম্পন্ন প্রভুর প্রতি বিশ্বাস (শ্রদ্ধা) থাকলেও মানুষের দ্বারা পাপাচার তো হতেই পারে না। উপরন্তু তাঁর প্রভাব ও গুণগুলিকে স্মরণ করলেও মানুষ সহজেই নির্ভয়তা, প্রসন্নতা এবং শান্তি পেয়ে যায়। আর প্রতি পদে সে তাঁর আশ্রয় অনুভব করে। তাতে তার উৎসাহ ও সাধনার বৃদ্ধি হয়ে পরমেশ্বর-প্রাপ্তি হয়ে যায়।

যদি এমন বিশ্বাসের উদ্রেক না হয়ে থাকে তাহলেও নিজের মনে তাঁকে এক মুহূর্তের জন্যও ভোলা উচিত নয়, না হলে খুবই বিপদের সম্মুখীন হতে হবে। কারণ মানুষ যারই চিন্তারত অবস্থায় দেহত্যাগ করে তাকেই সে প্রাপ্ত হয়। এমন কথা শাস্ত্র এবং মহাত্মাগণ বলেছেন। আর সেটি যুক্তিসঙ্গত। ঘুমাবার সময় মানুষ যেসব বিষয়ের চিন্তা করে সেইসব বস্তু প্রায়ই স্বপ্নে প্রত্যক্ষের মতো দেখায়। তেমনই মৃত্যুর সময়েও মানুষ যেসব জিনিসের চিন্তা করতে থাকে সেইসব জিনিসই সে পরে প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যে ভগবানকে চিন্তা করতে করতে দেহ ত্যাগ করে, সে ভগবানকেই পায় আর যে সংসারকে চিন্তা করতে করতে মারা যায় সে সংসারকেই পায়। তবে যদি কেউ মনে করে যে অন্তিম সময়ে ভগবানের চিন্তা করে তাঁকে পেয়ে যাবে তবে তা ভ্রমমাত্র। কেননা অন্তিম সময়ে ইন্দ্রিয় এবং মন দুর্বল ও ব্যাকুল হয়ে যায়। সেই সময় প্রায়ই পূর্বের অভ্যাস কাজ করে। এইজন্য মনুষ্যজন্ম লাভ করে এই ঝুঁকি মাথা থেকে নামিয়ে ফেলা উচিত। অর্থাৎ অন্য কোনো সাধন-ভজন না হলে অন্তত গুণ ও প্রভাবসহ সদাসর্বদা পরমেশ্বরকে স্মরণ করা উচিত। এতে তো কোনো খরচ করতে হয় না, কোনো পরিশ্রমও হয় না, বরং এই সাধনা প্রত্যক্ষ আনন্দ এবং শান্তিদায়ক। আর এটি করাও খুব সহজ। প্রয়োজন কেবল বিশ্বাসের (শ্রদ্ধার)। তারপর সব কাজ নিজে থেকেই সহজে হয়ে যেতে পারে। পরমেশ্বরের প্রতি বিশ্বাস হওয়ার জন্য মহাপুরুষদের কাছ থেকে তাঁর নাম, রূপ, গুণ, প্রভাব, প্রেম ও চরিত্রের কথা শুনে সে বিষয়ে মনন করা উচিত। এইরকম করলে সেইসব মহাপুরুষ ও পরমাত্মার দয়ায় পরমেশ্বরের প্রতি ভালবাসার উদ্রেক হয়ে তাঁকে পাওয়া

সহজ হয়ে যায়। কিন্তু দুঃখের কথা হল এই যে ঈশ্বর এবং পরলোকের প্রতি বিশ্বাস না থাকার কারণে আমরা সে দিকে মন দিয়ে নিজেদের অমূল্য জীবনকে আত্মোদ্ধাররূপ শ্রেষ্ঠ কাজে অতিবাহিত না করে বিনাশশীল, ক্ষণভঙ্গুর সাংসারিক বিষয়ে শেষ করে দিই। সাংসারিক বিষয়ে যে ক্ষণিক সুখের প্রতীতি হয় তা বাস্তব সুখ নয়, তা হল ছলনা। চিন্তা করলে এ জিনিস বোঝা যায় । ঈশ্বর আমাদের বুদ্ধি এবং জ্ঞান দিয়েছেন বিবেকের সঙ্গে ব্যবহার করবার জন্য। সেজন্য যিনি অবিবেচকের মতো জীবনযাপন করেন তিনি নিজের অজ্ঞতারই পরিচয় দেন। প্রত্যেক মানুষেরই চিন্তা করা উচিত যে **তিনি কে ? এই সংসার কী ? এর সঙ্গে তাঁর সম্পর্ক কী ? আমি কী করছি ? আমার কী করা উচিত ?**

পৃথিবীর সকল প্রাণী সুখ চায়, সে সর্বদা অফুরন্ত সুখ চায়, সামান্য দুঃখও সে চায় না। কিন্তু সে যেমন চায় তেমনটি হয় না, বরং তার বিপরীত হয়। তার কারণ হল নিজের সময়কে তার যেমনভাবে অতিবাহিত করা উচিত মূর্খতার দরুণ সেভাবে সে করে না।

পৃথিবীতে যাঁদের বিদ্বান এবং বুদ্ধিমান বলে মনে করা হয় তাঁরাও ভৌতিক অর্থাৎ জাগতিক সুখকেই সুখ মনে করে সেগুলিকে পাওয়ার মোহে বশীভূত হয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ে এবং তার জন্য আত্মনিয়োগ করাকেই উন্নতি বলে মনে করে। অনেকে অর্থকে সাংসারিক সুখপ্রাপ্তির সর্বোত্তম সাধন বলে মনে করেন আর তাই ধনসঞ্চয়কে নিজের উন্নতি বলে মনে করেন। আবার কিছু লোক মান-সম্মান-প্রতিষ্ঠার জন্য নিজের খ্যাতিবৃদ্ধিকেই উন্নতি বলে মনে করেন। কিন্তু এই সবই মূর্খতা। কেননা এই সমস্ত জিনিস অনিত্য হওয়ায় এগুলির দ্বারা ভ্রমবশতঃ প্রতীত হওয়া যে ক্ষণিক সুখ, তাও অনিত্য। অনিত্য হওয়ার কারণে শাস্ত্রকারগণ একে অসত্য বলেছেন। এটি মহাপুরুষ এবং শাস্ত্রকারদের মত এবং তা যুক্তিসঙ্গতও। যে জিনিস সৎ (অস্তিত্ববান) তার কখনও কোনোভাবে বিনাশ হয় না। তার উপর যত আঘাতই লাগুক, তা সব সময় অটল থাকে।

আর যে জিনিস অসৎ তার জন্য যত চেষ্টাই করুন তা কখনও থাকার নয়। এইসব কথা বুঝে নিয়ে ক্ষণভঙ্গুর, বিনাশশীল সুখ থেকে নিজের মন, বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়কে সরিয়ে নেওয়া উচিত। আর যা বাস্তবিক সুখ তার জন্য চেষ্টা করা উচিত। তার প্রাপ্তির পথে অগ্রসর হওয়াই হল প্রকৃত উন্নতি।

এখন আমাদের চিন্তা করতে হবে যে প্রকৃত সুখ কী এবং তা আছে কিসে ? এবং মিথ্যা সুখই বা কী এবং কোথায় ? সর্বশক্তিমান বিজ্ঞান আনন্দময় পরমাত্মাই হলেন নিত্য বস্তু। অতএব সেই পরমাত্মার সম্বন্ধ থেকে যে সুখ তাই সত্য এবং নিত্য সুখ। যা সাংসারিক তা সবই ক্ষণভঙ্গুর ও অনিত্য হওয়ার কারণে তাতে যে সুখ প্রতীত হয় সেটি ক্ষণিক এবং অনিত্য। এখন ভেবে দেখা যাক যে সাংসারিক পদার্থ ও সেগুলিতে প্রতীত হওয়া সুখ ক্ষণিক এবং অনিত্য কেমন করে ? দেখুন, যেমন প্রাতে গরুর দুধ দোহন করে তখনই পান করলে তার স্বাদ, গুণ, রূপ অন্য রকম হয়ে থাকে। আর সন্ধ্যা পর্যন্ত সেই দুধকে ফেলে রাখলে তা অন্য রকম হয়ে যায়। অর্থাৎ প্রাতঃকালে যেমন স্বাদ ও গুণ তা তাতে তখন থাকে না এবং তার রূপও কিছুটা ঘন হয়ে যায়। দ্বিতীয় এবং তৃতীয় দিনে স্বাদ, গুণ এবং রূপের কথা ছেড়ে দিন তার নামও বদলে যায়। অর্থাৎ কোনো ক্রিয়া না করলেও দুধ দই হয়ে যায়, মিষ্টতা টক হয়ে যায়, পিত্ত ও বায়ু নাশের স্থানে পিত্ত ও বায়ু বর্ধক হয়ে যায়। তরলতা আরও গাঢ় হয়ে যায়। আর দশ দিন পড়ে থাকলে স্বভাবতই তা বিষতুল্য হয়ে স্বাস্থ্যের পক্ষে খুব ক্ষতিকারক হয়ে যায়। চিন্তা করে দেখুন যে, কোনো কিছু না করলেও অমৃতের মতো দুধও ক্ষণ পরিণামী হওয়ার কারণে আগের স্বাদ, গুণ, রূপ এবং নামের অস্তিত্ব হারিয়ে ফেলে। এগুলি যদি নিত্য হোত তাহলে এগুলির পরিবর্তন বা বিনাশ হোত না। অন্য সব বস্তু সম্পর্কেও এটি বুঝে নেওয়া উচিত। অতএব এইসব সাংসারিক বস্তুতে প্রতীত হওয়া সুখ বাস্তবে সুখ নয়। যদি মনে হওয়া ক্ষণিক সুখকে সুখ বলে ধরে নেওয়া হয়, তাহলেও সেগুলিতে তার চেয়েও বেশি দুঃখও আছে। সেজন্য সেগুলি ত্যাজ্য। একজন পুরুষ স্ত্রীর সঙ্গে রমণ

করে। সেই সময় তার কিছুটা সুখ অনুভূত হয়। কিন্তু পরে তা থেকে রোগের বৃদ্ধি হয়। তার বল, বুদ্ধি, তেজ এবং আয়ুর ক্ষয় হয় এবং সে খুবই দুঃখী হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। এইসব কাজ যদি ধর্মবিরুদ্ধ হয় তাহলে ইহলোকে অপকীর্তি এবং পরলোকে নরকপ্রাপ্তি ঘটে। এবার ভেবে দেখুন যে ক্ষণিক সুখের পরিবর্তে কত বেশি দুঃখ ভোগ করতে হয়। এইরকম অন্য সব বস্তু ভোগ করবার বিষয়েও চিন্তা করতে হবে। কেননা বিষয় ভোগ করলেই শরীর এবং ইন্দ্রিয় ক্ষীণ হয়ে যায় এবং অন্তঃকরণ দূষিত, দুর্বল ও চঞ্চল হয়ে যায়। পূর্বকৃত পুণ্যের ক্ষয় ও পাপের বৃদ্ধি হয়। শুধু তাই নয়, ধীর এবং বীর পুরুষও বিলাসী হয়ে ওঠে ফলে ঈশ্বর প্রাপ্তির পথে আরোহণও করতে পারে না। যদি ওই পথে আরোহণ করতে চেষ্টা করেও তাতে সহজে সফল হয় না।

এইজন্য এইসব বস্তু ভোগের উদ্দেশ্যে অর্থ সংগ্রহ করাও ভুল। কেননা প্রথমত অর্থ উপার্জন করা পরিশ্রমসাধ্য। শুধু তাই নয়, এজন্য ঘোর নরকদায়ক পাপ অর্থাৎ অনেক অনর্থও করতে হয়। তাছাড়া এই অর্থ রক্ষা করাও খুব কষ্টসাধ্য ব্যাপার। কখনও কখনও তো তা রক্ষা করতে প্রাণের ঝুঁকি এসে যায়। এ খরচ করতে এবং দান করতেও দুঃখ কম হয় না। লোকে বলে যে দেওয়া এবং মরা সমান। অর্থ খোয়া গেলেও খুব দুঃখ হয়। যখন মানুষ এই সংগ্রহ ত্যাগ করে পরলোকে যায় সেই সময়েও দুঃখের কোনো পার থাকে না। তাহলে ক্ষণিক সুখ-প্রাপ্তির জন্য ভীষণ দুঃখের সম্মুখীন হওয়া মূর্খতা ছাড়া আর কী ! তাছাড়া সেই অর্থের দ্বারা প্রাপ্ত বিষয়সুখও নিজের ইচ্ছানুসার পাওয়া যায় না। পৃথিবীতে যাঁদের ব্যবহারিক দৃষ্টিতে বিদ্বান ও বুদ্ধিমান মনে করা হয় তাঁরা অর্থকে ত্যাগ করে অনুশোচনায় দগ্ধ হয়ে চলে গিয়েছেন। বড় বড় প্রতাপশালী, প্রভাবশালী বলবান মানুষেরাও অর্থ সঙ্গে নিয়ে যেতে পারেননি, তাহলে আমাদের আর কথা কী ? পৃথিবীতে এটিও প্রায়ই দেখা যায় যে একজন অর্থ জোগাড় করেন আর অন্যজন তা ভোগ করেন। এটি তো কোনো কোনো ক্ষেত্রে সংগ্রহকারীর

উদ্দেশ্যের বিপরীত। যেমন মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে। কিন্তু তা প্রায়ই ভোগ করে অন্য লোক। এটি তার মূর্খতার পরিচয়। মৌমাছি তো সাধারণ কীট। কিন্তু মানুষ হয়েও যদি সে একথা চিন্তা না করে তবে সে সেই কীটের চেয়েও অধম।

একজন প্রতিদিন হাজার টাকা রোজগার করে। হাজার টাকা তার ঘরে এসে গেল। পরের দিন সে দু হাজার টাকার জন্য চেষ্টা করবে। এখন মনে করুন যে পরের দিন তার মৃত্যু হবে। আর একথা জানা যে, মৃত্যুর পর তার এই অর্থের সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকবে না এবং মৃত্যু আগে থেকে না জানিয়ে হঠাৎই চলে আসে এবং সম্পূর্ণ অর্থ দিয়ে অনেক চেষ্টা করলেও মৃত্যু থেকে সে মুক্তি পাবে না, তার মৃত্যু অনিবার্য। এই পরিস্থিতিতে যেসব শিক্ষিত এবং প্রতিষ্ঠিত মানুষের ধনসঞ্চয় করাই লক্ষ্য তাঁদের অজ্ঞতাকে মধুসঞ্চয়কারী মৌমাছির চেয়েও অনেক বেশি বললে তা অযৌক্তিক বলা যায় না।

যারা নাম-খ্যাতির জন্য অর্থ ও কায়মনপ্রযুক্ত করে তারাও বুদ্ধিমান নয়। কেননা নাম-খ্যাতি প্রকৃত সুখের বাধা। আর মৃত্যুর পরও নাম-খ্যাতির সঙ্গে আমাদের কোনো সম্বন্ধ থাকে না।

অতএব সেই ধনী-মানী বিষয়াসক্ত ভাইদের কাছে আমার সবিনয় নিবেদন এই যে পরমেশ্বর এবং তাঁর আজ্ঞাপালনরূপ ধর্ম ব্যতীত এই লোকে এবং পরলোকে কোথাও আপনাদের কোনো সাথী বা সহায়ক নেই। সুতরাং যদি নাম-খ্যাতির ইচ্ছা থাকে তাহলেও ভগবৎপ্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করা উচিত। কেননা যখন সেই ব্রহ্মকে অভেদরূপে প্রাপ্ত হয়ে যাবেন অর্থাৎ যখন তিনি পরমাত্মা হয়ে যাবেন তখন তো বেদ ও শাস্ত্রগুলিতে যে বিজ্ঞান-আনন্দময় ব্রহ্মের মহিমা গীত হয়েছে তথা ভগবান শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের যে খ্যাতি তা সবই তার হয়ে যাবে। শুধু তাই নয়, জগতে যত খ্যাতি হয়েছে এবং ভবিষ্যতে হবে, সে সবই আপনাদের হবে। কেননা যে মানুষ ব্রহ্মকে পেয়ে যান তিনি সকলের আত্মা হয়ে যান। তাই সকলের

খ্যাতিই হল তাঁর খ্যাতি এবং সকলের খ্যাতিও তাঁর কেবল একটি অংশেই স্থিত। গীতায় শ্রীভগবান বলেছেন—

যদ্যদ্বিভূতিমৎসত্ত্বং শ্রীমদূর্জিতমেব বা।
তত্তদেবাবগচ্ছ ত্বং মম তেজোংঽশসংভবম্॥

(১০।৪১)

'যত বিভূতিযুক্ত অর্থাৎ ঐশ্বর্যযুক্ত, কান্তিযুক্ত এবং শক্তিযুক্ত বস্তু আছে সেগুলিকে তুমি আমার তেজের অংশের অভিব্যক্তি বলে জেনে রাখ।'

এবার চিন্তা করা উচিত যে তুচ্ছ লৌকিক খ্যাতির ইচ্ছা করা এবং তার জন্য নিজের তন (শরীর), মন, ধন নষ্ট করা কি উচিত ! নিজের খ্যাতি লাভের জন্যও ভগবানকে পাবার ইচ্ছা করা উচিত নয়, তিনি তো আমাদের পরম ধ্যেয় এবং আশ্রয়। কারণ সেই পদকে পাওয়ার পর আর কিছু পাওয়া বাকি থাকে না। একেই মুক্তি, পরমপদ এবং প্রকৃত সুখ লাভ বলা হয়। যেমন জোনাকির সূর্যের সঙ্গে এবং জলবিন্দুর সাগরের সঙ্গে মোকাবিলা করা সম্ভব নয় তেমনই সমগ্র পৃথিবীর সকল সুখকে একত্রিত করলেও তার মোকাবিলা সম্ভব নয়। ভগবান গীতায় বলেছেন—

যাবানর্থ উদপানে সর্বতঃ সংপ্লুতোদকে।
তাবান্ সর্বেষু বেদেষু ব্রাহ্মণস্য বিজানতঃ॥ (২।৪৬)

'সকল দিক থেকে পরিপূর্ণ জলাশয়কে প্রাপ্ত হওয়ার পর ছোট জলাশয়ের প্রয়োজন যতটা থাকে তেমনই ব্রহ্মকে জানার পর ব্রাহ্মণের কাছে বেদের প্রয়োজন ততটাই থাকে। অর্থাৎ বড় জলাশয়কে পাওয়ার পর জলের জন্য ছোট জলাশয়ের আর প্রয়োজন থাকে না তেমনই ব্রহ্মানন্দকে পেয়ে গেলে আনন্দের জন্য বেদের প্রয়োজন থাকে না।'

যেমন স্বপ্নে পাওয়া ত্রিলোকের রাজ্য-সুখ সামান্য জাগ্রত সুখের মোকাবিলা করতে পারে না এবং স্বপ্নে প্রাপ্ত রাজ্যকে বিক্রি করতে চাইলে এক পয়সাও মূল্য পাওয়া যায় না, কেননা জেগে ওঠার পর সেই স্বপ্ন-প্রাপ্ত রাজ্যের কোনো অস্তিত্বই থাকে না। তেমনই পরমাত্মাকে পেয়ে যাওয়ার পর

এই সংসার ও সাংসারিক সুখের কোনো অস্তিত্ব থাকে না। অতএব এই রকম অনন্ত সুখকে ছেড়ে দিয়ে যে ক্ষণভঙ্গুর, বিনাশশীল মিথ্যা সুখের জন্য আত্মনিয়োগ করে তার চেয়ে বড় মূর্খ আর কে আছে ?

দ্বিতীয়ত, যে প্রেমে মুগ্ধ হয়ে ভেদরূপে ভগবানের উপাসনা করে তার তো আরও অদ্ভুত লীলা ! সে প্রভুর প্রসন্নতায় প্রসন্ন এবং তাঁর সুখে সুখী থাকে। প্রভুর প্রতি অনন্য প্রেম, নিত্য সংযোগ এবং তাঁর প্রসন্নতার জন্যই সেই ভক্তের সকল চেষ্টা হতে থাকে। নিজের প্রেমাস্পদ সগুণ ব্রহ্মের প্রতি তন-মন-ধন এবং নিজেকে সমর্পণ করে সে প্রেম ও আনন্দে মুগ্ধ হয়ে যায়। একমাত্র ভগবানই তার পরম আশ্রয়, জীবন, প্রাণ, ধন এবং আত্মা। এইজন্য সেই ভক্ত মুহূর্তের জন্য তাঁর সঙ্গে বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারে না। সেই প্রিয়র নাম, রূপ, গুণ, প্রেম, প্রভাব, রহস্য ও চরিত্রের শ্রবণ, মনন এবং কীর্তন করতঃ তাঁতে সদাসর্বদা রমণ করে।

এই আনন্দে সে এত মুগ্ধ হয়ে যায় যে উপরে বর্ণিত অভেদরূপী পরমগতি অর্থাৎ মুক্তিরূপ সুখেরও সে প্রত্যাশা করে না। মাছ যেমন জলের বিচ্ছেদ সহ্য করতে পারে না তেমনই ভগবানের বিরহ তার কাছে অসহ্য হয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ভগবানকে পাওয়ার পর ভগবান যখন তার হৃদয়স্থিত হন তখন কাপড় চোপড়ের ব্যবধানও তার কাছে বিঘ্ন বলে মনে হয়, সে ব্যবধান রহিত হয়ে সদা-সর্বদা মিলিত হতে চায় এবং মুহূর্তের জন্যও ভগবান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় না। এই রকম ভগবৎ-প্রাপ্তিরূপ আনন্দে যিনি মগ্ন তাঁর গুণাবলীর বর্ণনা শেষ (অনন্তদেব), মহেশ, গণেশ প্রভৃতি কেউই বাণী দ্বারা করতে পারেন না। অন্যদের তো কথাই নেই মুনি, ঋষি, মহাত্মা এবং সমগ্র বেদ যে পরমেশ্বরের মহিমার গান করছেন সেই পরমেশ্বরও স্বয়ং সেই ভক্তের মহিমা কীর্তন করেন। তাঁর প্রেমে বিক্রিত হয়ে এবং সেই ভক্তের ভাব অনুসারে ভাবিত হয়ে তাঁর ইচ্ছানুসারে প্রকট হয়ে তাঁর সঙ্গে রসময় ক্রীড়া করতে থাকেন। অর্থাৎ ভক্ত যেভাবে প্রসন্ন হবেন সেই ভাবেই তিনি তাঁর সঙ্গে লীলা করতে থাকেন।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে ভেদরূপে এবং অভেদরূপে পরমাত্মাকে পাওয়ার মধ্যে কী প্রভেদ, তাহলে এই কথাই বলা যায় যে অভেদরূপে যিনি পরমাত্মার উপাসনা করেন তিনি নিজেই প্রকৃত সুখ অর্থাৎ বিজ্ঞান-আনন্দঘন পরমাত্মা হয়ে যান আর ভেদরূপে যে ভক্ত উপাসনা করেন তিনি মিত্ররূপে সেই রসময় পরমাত্মার স্বরূপের দিব্য রস লাভ করেন অর্থাৎ সেই অমৃতময় সগুণ স্বরূপে পরমাত্মার সঙ্গে মিলনের আনন্দ অনুভব করেন।

বাণী এই পর্যন্ত পৌঁছতে পারে। এর পর উভয় প্রকারের ভক্তের একটিই ফল—অনির্বচনীয় স্থিতি হয়। একে বৈদিক শাস্ত্র, শিব-সনক, শারদা এবং সাধু-মহাত্মা বা যাঁরা এই স্থিতি লাভ করেছেন তাঁরা কেউই কোনো ভাবে বর্ণনা করতে পারেন না। যা কিছু বর্ণিত হয় সেই সৎ থেকে এটি খুবই ভিন্ন। কেননা এখানে বাণীর তো কথাই নেই, মন এবং বুদ্ধিও পৌঁছতে পারে না।

এইজন্য দুঃখ ও বিঘ্ন বলে বুঝে নিয়ে বিনাশশীল, ক্ষণভঙ্গুর তুচ্ছ ভৌতিক সুখকে পদাঘাত করে পরমাত্মাকে প্রাপ্তিরূপ যথার্থ সুখের জন্য কটিবদ্ধ হয়ে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। এইভাবে যিনি চেষ্টা করেন সেই ব্যক্তির পক্ষে পরমাত্মার দয়ায় তাঁকে সহজেই পাওয়া সম্ভব।

—— ০ ——

ভগবদ্দর্শনের জন্য উৎকণ্ঠা

অনেকে বলে থাকেন যে যথাশক্তি চেষ্টা করা সত্ত্বেও ভগবান তাঁদের দর্শন দেন না। সেই সব লোক ভগবানকে 'নিষ্ঠুর, কঠোর' প্রভৃতি শব্দে অভিহিত করে থাকেন এবং এই কথাই মনে করে থাকেন যে ভগবানের হৃদয় বজ্রের মতো কঠিন আর তা কখনই বিগলিত হয় না। তাঁর কী দায় পড়েছে যে তিনি আমাদের খবর নেবেন, আমাদের দর্শন দেবেন এবং আমাদের আপন করে নেবেন—এই রকম অভিযোগ অনেক লোক করে থাকেন।

কিন্তু অবস্থা সম্পূর্ণ বিপরীত। আমাদের প্রতি প্রভুর অপার কৃপা। তিনি দেখতে থাকেন সেই সামান্য একটু অবকাশ, যা পেলেই তিনি প্রকট হয়ে যাবেন, একটু মাত্র সুযোগ পেলেই ভক্তকে দর্শন দেবেন। সাধনার পথে তিনি প্রতি পদে আমাদের সহায়তা করতে থাকেন। সংসারেও দেখা যায় যে, যেখানে বিশেষ টান থাকে, যে মানুষটির প্রতি বিশেষ আকর্ষণ থাকে সেখানে বা তার কাছে অন্য কাজ ফেলে দিয়ে আমরা চলে যাই। যেখানে যেতে আগ্রহ হয় না সেখানে প্রায়ই একথা মেনে নিতে হবে যে সেখানে ভালবাসার তীব্রতা কম। আমাদের মতো সাধারণ মানুষদেরই যখন এমন অবস্থা তখন প্রেম ও দয়ার অপার সমুদ্র ভগবান যদি সামান্য ভালবাসাতেই আমাদের দর্শন দিতে প্রস্তুত থাকেন তবে তাতে আশ্চর্যের কী আছে!

ভগবানের প্রাকট্যে যে বিলম্ব তার প্রধান কারণ হল আমাদের আকর্ষণের ন্যূনতা। প্রভু তো প্রেম ও দয়ার মূর্তি। তাহলে কেন তিনি আসতে দেরী করেন ? তার কারণ স্পষ্ট। আমরা তাঁর দর্শন লাভের যোগ্য নই। আমাদের মধ্যে এখন শ্রদ্ধা ও প্রেম খুব কম। আমরা যদি তার যোগ্য হতাম তাহলে ভগবান নিজে এসে আমাদের দেখা দিতেন। কেননা ভগবান হলেন পরমদয়ালু, সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী, সর্বশক্তিমান এবং সর্বান্তর্যামী। কিন্তু আমাদের অন্তরে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা এবং ভালবাসা খুবই কম। অতএব শ্রদ্ধা ও প্রেম বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁর তত্ত্ব, রহস্য, গুণ এবং প্রভাব জানার জন্য আমাদের প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। ভগবানের প্রতি শ্রদ্ধা এবং প্রেম হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে পাওয়া যায়নি এমন কখনই হতে পারে না। বাধ্য হয়ে ভগবান তাঁর শ্রদ্ধালু ভক্তের শ্রদ্ধাকে ফলবান করে দেন। যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁর কৃপার প্রতি আমাদের পূর্ণ বিশ্বাস না জন্মাচ্ছে ততক্ষণ প্রভুর প্রসাদ আমরা কী করে লাভ করতে পারি। যদি আমাদের এমন বিশ্বাস হয়ে যায় যে ভগবানের দর্শন লাভ হয় এবং অমুক ব্যক্তিটি ভগবানকে দর্শন করেছেন তাহলে তাঁর সঙ্গে আমাদের ব্যবহার কেমন হবে তা আমরা অনুমানও করতে পারি না। তাহলে স্বয়ং ভগবানকে পেয়ে গেলে যে দশা হয় তা আন্দাজ করাও

অসম্ভব।

রাসলীলার সময় ভগবান যখন অন্তর্ধান করেন তখন গোপীদের কেমন অবস্থা হয়েছিল ? মুহূর্তের জন্য ভগবানের সঙ্গে বিচ্ছেদ তাঁদের কাছে অসহ্য হয়ে গিয়েছিল। সেজন্য বাধ্য হয়ে ভগবানকে প্রকট হতে হয়েছিল। দুর্বাসা যখন তাঁর দশ হাজার শিষ্যকে নিয়ে ভোজন করার জন্য অসময়ে এসে উপস্থিত হয়েছিলেন তখন তাঁদের খাওয়াবার কোনো উপায় না দেখে দ্রৌপদী ব্যাকুল হয়ে ভগবানকে স্মরণ করেছিলেন। তাঁর ডাকা মাত্রই ভগবান এমনভাবে প্রকট হয়েছিলেন যে মনে হয়েছিল তিনি যেন কাছেই দাঁড়িয়ে ছিলেন। বিশ্বাস থাকলে সকল ভক্তের প্রায় এমন অবস্থাই হয়ে থাকে। ভক্ত নরসীর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে তার মেয়ের বিয়ের অত্যাবশ্যক সামগ্রী নিয়ে হরি অবশ্যই আসবেন। তাই সে মগ্ন হয়ে গেয়ে চলেছিল, **'বাই আসী, আসী আসী, হরি ঘণে ভরোসে আসী।'** হরি যে আসবেন তাতে তার একটুও সংশয় ছিল না। সুতরাং ভগবানকে সময়মতো আসতেই হয়েছিল।

ভগবানের আসতে যে দেরি হচ্ছে তার একমাত্র কারণ হল দৃঢ় বিশ্বাসের অভাব। যেভাবেই হোক স্থির সিদ্ধান্তে এসে যেতে হবে। স্থির সিদ্ধান্তে এসে যাওয়ার পর ভগবান আসবেন না, এমন হতেই পারে না। তিনি ভক্তকে নিরাশ করেন না, এটিই তাঁর মান-মর্যাদা। মাঝে মাঝে আমাদের পথে এমন সব বিঘ্ন উপস্থিত হয় যার কারণে আমাদের মন বিচলিত হয়ে পড়ে । সে অন্য কথা, কিন্তু সাধক যদি সেই সময় সংহত হয়ে প্রভুকে দৃঢ়তার সঙ্গে ধরে রাখেন এবং প্রহ্লাদ যেমন বিঘ্নতে ঘাবড়ে যাননি তেমনভাবে ঘাবড়ে না যান তবে তাঁর উদ্দেশ্য-সিদ্ধি হবেই। প্রভু তো আমাদের শ্রদ্ধাকে দৃঢ় করবার জন্যই কখনও নিষ্ঠুর আবার কখনও কোমল ব্যবহার ও অবস্থার সৃষ্টি করেন।

বস্তুত শ্রদ্ধা এতই শক্তিশালী যে ভগবানকে বাধ্য হয়ে সেই শ্রদ্ধাকে ফলীভূত করার জন্য প্রকট হতে হয়। পরশ পাথর যদি সত্যই পরশ পাথর হয় এবং লোহা যদি সত্যই লোহা হয় তো তা স্পর্শ মাত্র সোনা হয়ে যাবে। সেই

রকম শ্রদ্ধাবানও ভগবানকে লাভ করে থাকেন। দয়ালু ভক্তের মধ্যে যে ঘাটতি থাকে ভগবান সেটি পূরণ করে তাঁর উদ্দেশ্য সিদ্ধ করে দেন। শ্রদ্ধা থাকলে ভগবানের কৃপায় সকল ন্যূনতার পূরণ নিজে থেকেই হয়ে যায়। আমাদের মধ্যে শ্রদ্ধা-প্রেম কম বলেই ভগবান প্রকট হন না। তা না হলে তাঁর দয়ালু ও প্রেমপূর্ণ স্বভাব দেখে মনে হয় না যে তিনি দর্শন না দিয়ে নিশ্চিন্ত থাকবেন। রাবণ সীতাকে হরণ করলে রাম সেই রকমই ব্যাকুল হয়েছিলেন যেমন কোনো কামাসক্ত পুরুষ তার প্রেয়সীর জন্য হয়ে থাকে। এর কারণ কী ? কারণ হল এই যে সীতা রাম ছাড়া এক মুহূর্তও থাকতে পারতেন না। ভগবান বলেন যে, যে আমাকে যেভাবে ভজনা করে আমিও তাকে সেইভাবে ভজনা করি।

যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।

(গীতা ৪।১১)

ভগবান তো প্রকট হওয়ার জন্য প্রস্তুত। তিনি যেন প্রস্তুতই রয়েছেন—লোকেরা তাঁকে ভালবাসুক এবং তিনি প্রকট হবেন। সীতার যেমন রামচন্দ্রের প্রতি গভীর প্রেম ছিল সেই রকম প্রেম যদি প্রভুর প্রতি আমাদের হয়ে যায় তাহলে প্রভু আমাদের দর্শন দেবার জন্য সদাই প্রস্তুত। যিনি হরির জন্য লালায়িত হরিও তাঁর জন্য ততটাই লালায়িত থাকেন।

প্রভুর প্রতি শ্রদ্ধা-প্রীতি বৃদ্ধি পাক, তাঁর চিন্তা বজায় থাক, এক মুহূর্তের জন্যও তাঁকে যেন ভুলে না থাকি এমন লক্ষ্যই আমাদের সর্বদা নির্দিষ্ট থাকা চাই। তিনি আমাদের যেমন ইচ্ছা রাখুন, যেখানে ইচ্ছা রাখুন তাঁর স্মৃতি অটল থাকা চাই। তাঁর প্রসন্নতা আমাদের প্রসন্নতা, তাঁর সুখেই আমাদের সুখ এমন কথা মানা উচিত। প্রভু যদি আমাদের নরকে রাখতে চান তাহলেও আমাদের বৈকুণ্ঠের দিকে তাকানো উচিত নয়। বরং নরকে বাস করাতেই পরম আনন্দ বলে মেনে নেওয়া উচিত। এইভাবে প্রভুর শরণাগত হয়ে গেলে তাঁর কাছে ইচ্ছা বা যাচ্ঞা করার অর্থ হয় না। যখন প্রভু আমাদের এবং আমরা প্রভুর হয়ে যাই তখন আর বাকী কী থাকে ? আমরা তো প্রভুর

শিশু। মা শিশুর দোষের প্রতি দৃষ্টি দেন না। তাঁর হৃদয়ে শিশুর প্রতি অপরিসীম ভালবাসা থাকে। প্রভু যদি আমাদের দোষের দিকে নজর রাখেন তাহলে আমাদের কোথাও স্থান হবে না। প্রভু তো সুযোগ পেলেই প্রকট হয়ে যাওয়ার জন্য সর্বদা উৎসুক থাকেন। কিন্তু আমরাই তাঁর প্রকট হওয়ার ক্ষেত্রে বাধক হয়ে আছি। দেখে হয়তো একথা মনে হয় না। বাইরে থেকে মনে হয় যে আমরা তাঁর দর্শনের জন্য লালায়িত, কিন্তু অন্তরে তাঁকে পাওয়ার জন্য লালসা কোথায় ? এখন অপেক্ষা করো, একথা আমরা মুখে না বললেও আমাদের কর্মে সেটিই প্রমাণ হয়। প্রভুর প্রকটিত হওয়ার দেরি সহ্য করাই হল তাঁকে অপেক্ষা করতে বলা। প্রভুর সঙ্গে আমাদের বিচ্ছেদ এই কারণেই হচ্ছে যে তাঁর বিচ্ছেদে আমরা ব্যাকুল হই না। যখন আমরা নিজেরাই তাঁর বিচ্ছেদ সহ্য করতে প্রস্তুত এবং তাঁর বিচ্ছেদে আমাদের মনে কখনও বিরহ বা দুঃখ হয় না তখন প্রভুর কী দায় পড়েছে ! যদি আমাদের মধ্যে ছটফটানি থাকতো এবং তাতেও তিনি না আসতেন তাহলে আমাদের কিছু বলার থাকতো। তাঁকে ছাড়াই আমরা আনন্দে বেঁচে আছি। এই অবস্থায় তিনি যদি না আসেন তাহলে তাতে তাঁর কী দোষ ? প্রকট হওয়ার জন্য তিনি প্রস্তুত। কিন্তু যতক্ষণ আমাদের মধ্যে ঔৎসুক্য না হয় ততক্ষণ তিনি কী করে আসবেন ? তাঁর দর্শন লাভের জন্য প্রয়োজন হল প্রবল আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষা কেমন হওয়া উচিত তা প্রভুই জানেন। যে আকাঙ্ক্ষায় তিনি প্রকট হয়ে যান সেই আকাঙ্ক্ষাকেই প্রকৃত আকাঙ্ক্ষা বলে বুঝতে হবে। অতএব যতক্ষণ না তিনি আসছেন ততক্ষণ আকাঙ্ক্ষাকে বাড়াতে হবে। ঘড়া ভর্তি হয়ে গেলে জল নিজে নিজেই উপর থেকে বইতে থাকে।

ভগবৎ প্রেমের অবস্থাই অপূর্ব। ভগবানের প্রসঙ্গে যখন আলোচনা চলে, তাঁর মধুরতা নিয়ে কথা হয় তখন যদি ভগবান স্বয়ং এসে উপস্থিত হন তাহলেও আলোচনা চালিয়ে যেতে হবে, বন্ধ করা চলবে না। প্রিয়তমের আলোচনায় এক মিষ্টতা আছে যার স্বাদ এক বার পেয়ে গেলে আর কিছু

ভাল লাগে না। প্রীতির রীতিই অনুপম। যিনি প্রীতির রস পেয়েছেন তাঁর পেতে আর কী বাকি থাকে ? প্রভু তো কেবল ভালবাসাই দেখেন। প্রভুর ভালবাসা প্রভুর চেয়েও বড়। শ্রদ্ধা-ভক্তির সঙ্গে প্রভুর গুণ, প্রভাব এবং রহস্যসহ ধ্যানে তন্ময় হয়ে প্রভুর প্রেমামৃত পান করা হল প্রভুর প্রীতির আস্বাদ গ্রহণ করা অথবা হরির রসে নিমজ্জিত হওয়া।

দুজন প্রেমিকের মধ্যে যদি কথা বলা বন্ধ হয় তাহলে যে বেশি প্রেমিক সে-ই পরাজিত হয়। স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে কথা না বলার যদি জেদ হয়ে যায় তাহলে সে-ই হেরে যায় যার ভালবাসা বেশি। এইভাবে যখন ভক্ত ও ভগবানের মধ্যে প্রতিযোগিতা খাড়া হয়ে যায় তখন ভগবানকেই হেরে যেতে হয়, কেননা প্রভুর চেয়ে বড় প্রেমিক কেউ নেই। তাঁকে এমনভাবে ব্যাকুল করে দিতে হবে যাতে তিনি আমাদের ছেড়ে এক মুহূর্তও থাকতে না পারেন। তাহলে তাঁকে হার মেনে নিতে হবে—তাঁকে আসতে বাধ্য হতে হবে। আমাদের এই রকম ব্যবস্থাই করতে হবে। প্রেমের দ্বারা তাঁকে মোহিত করে দিতেই হবে, তাহলে তাঁকে ধাক্কা মেরে বের করে দিলেও তিনি যেতে চাইবেন না।

প্রভুর সঙ্গে আমাদের ব্যবহার সেই রকমই হওয়া উচিত যেমন ব্যবহার স্ত্রীর স্বামীর সঙ্গে হয়ে থাকে। স্ত্রী যেমন তার ভালবাসা ও আচার-আচরণের দ্বারা স্বামীকে মোহিত করে দেয় তেমনভাবেই আমাদেরও ভালবাসা ও আচরণের দ্বারা ভগবানকে মোহিত করে দিতে হবে। তাঁকে নিজেদের প্রতি আসক্ত করে নিন এবং খোশামোদ করবেন না। তাহলে তিনি এক মুহূর্তের জন্যও আমাদের দুয়ার থেকে সরে যাবেন না। তিনি তো প্রেমের ভিখারী, প্রেমের বন্দী হয়ে আছেন, যাবেন কোথায় ? স্বামী তার স্ত্রীর ভালবাসাকে অবহেলা কী করে করবে ? তেমনই প্রভুও তাঁর ভক্তের ভালবাসাকে অনাদর কী করে করবেন ? এমন হয়ে গেলে আমাদের ছাড়া তিনি থাকতেই পারবেন না। তিনি চিরকাল প্রেমের অধীন। একবার প্রভুকে নিজের প্রেমপাশে বেঁধে নিন তাহলে তিনি চিরকালের জন্য বন্দী হয়ে থাকবেন।

প্রভুকে বশীভূত করবার রীতি স্ত্রীর কাছ থেকে শিখতে হবে। তাঁর সঙ্গে সেই রকম সম্পর্কই গড়ে তুলতে হবে। এইটিই হল মাধুর্য ভাব। বাইরের বেশ বদলাতে হবে না। ভিতরের ভালবাসার প্রগাঢ়তায় তাঁরই হয়ে যান। এইটিই তাঁকে লাভ করবার সর্বোত্তম উপায়।

প্রভু খুবই দয়ালু এবং উদার চরিত্রের। এইজন্য অল্প ভালবাসাতেও তাঁকে পাওয়া যায়। কিন্তু আমাদের চলতে হবে পূর্বোক্ত ভালবাসাকে লক্ষ্য করে। কেননা সর্বোচ্চ লক্ষ্য স্থির করে অগ্রসর হলে তবেই প্রেমের প্রাপ্তি হয়। যদি সেই লক্ষ্য স্থির করে পূর্ণ প্রেম হয়ে যায় তবে তা হবে খুবই সৌভাগ্যের কথা। এমন মানুষকে আদর্শ এবং দর্শনীয় বলে মনে করা হয়। তাঁর কৃপা-কটাক্ষে অন্যেও কৃতকৃত্য হয়ে যায় ; তাহলে তাঁর সম্বন্ধে আর কী বলা যাবে ?

—— ০ ——

আচরণ করার মতো পঁচিশটি কথা

১. সন্ধ্যা-আহ্নিক খুবই যত্নের সঙ্গে করা উচিত। অর্থের দিকে মন রেখে গায়ত্রী মন্ত্র জপ করতে হবে এবং '*হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে, হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে*' এই মন্ত্রটিও শ্রদ্ধা-ভক্তি পূর্বক জপ-কীর্তন করতে হবে।

২. সকলেরই গীতার অর্থ বোঝবার জন্য বিশেষ প্রয়াস করতে হবে। গীতাচর্চার খুব অভ্যাস করুন। যখন পাঠ করবেন তখন তার অর্থের দিকে মন দেবেন। প্রথমে মানেটা পড়ে নিন, তারপর শ্লোক পড়বেন।

৩. নিজেদের ঘরে থাকলেও, প্রত্যেকের স্বল্প সময়ের জন্য হলেও একান্তে থাকা উচিত। একান্তে থেকে ভগবানের ধ্যান করুন। আত্মার কল্যাণ কী করে হবে সেকথা প্রথমে চিন্তা করুন। যদি কোনো কিছু স্থির করতে না পারেন তাহলে ভগবানের কাছে প্রার্থনা করুন—

কার্পণ্যদোষোপহতস্বভাবঃ
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্মসংমূঢ়চেতাঃ।
যচ্ছ্রেয়ঃ স্যান্নিশ্চিতং ব্রূহি তন্মে
শিষ্যস্তেঽহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্॥

(গীতা ২।৭)

'ভীরুতারূপ দোষে অপহৃত স্বভাববিশিষ্ট এবং ধর্ম বিষয়ে মোহাবিষ্ট আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি যে, যে সাধন অবশ্যই কল্যাণকারী তা আমাকে বলুন ; কেননা আমি আপনার শিষ্য। সেজন্য আপনার শরণাগত আমাকে শিক্ষা প্রদান করুন।'

এই শ্লোক অনুসারে শরণাগত হয়ে রোদন করুন। তারপর ধ্যান করুন। আলাদা ঘরে ধ্যান করবেন এবং বসার আসনও আলাদা রাখবেন।

৪. সেবা করার অভ্যাস তৈরি করতে হবে। আমাদের মধ্যে সেবা করার অভ্যাস খুব কম। নিজেদের বাড়িতে আগত অতিথিদের খুব সেবাযত্ন করা উচিত। যদি কোনো সৎসঙ্গী পাওয়া যায় তাহলে তাঁকে ভগবৎ বিষয়ে প্রশ্ন করুন। ভগবৎসম্পর্কীয় কথার অনুসন্ধানে খুব তৎপর থাকুন। কেউ যদি সৎসঙ্গ করে আসেন অথবা সেই সম্পর্কে যদি কোনো চিঠি এসে থাকে তাহলে তা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করা উচিত। গীতার শ্লোকগুলির মধ্যে যদি কোনো নতুন কথা জানতে পারেন তবে সেটিকে কণ্ঠস্থ করে নিন।

৫. যে সাধন জানানো হয়েছে তাকে কঠিন মনে করবেন না। সব সময় এই সাহস মনে রাখুন যে অন্যায়-দুরাচার কেমন করে আসবে ? আমরা যদি সজাগ থাকি তবে আমাদের ঘরে চোর ঢুকবে কী করে ?

৬. এ্যালোপ্যাথি ওষুধ খাওয়া ঠিক নয়। এই সকল ওষুধে খুব ক্ষতি হয়, দোকানের মিষ্টি, পুরি, দুধ-দই, চা প্রভৃতি কিছু খাওয়া উচিত নয়।

৭. সার কথা হলো এই যে, সৎসঙ্গে যতো কথা জানানো হয়েছে সেগুলি স্পষ্টরূপে বুঝে নিন এবং তা যদি জীবনের নিয়ম করে গ্রহণ করা

হয় তাহলে অবশ্যই পরিবর্তন আসবে।

৮. রান্না পবিত্রতার সঙ্গে করা চাই। শিশুদের রান্নাঘরে যেতে দেওয়া ঠিক নয়। রান্না করার সময় কাচা কাপড় পরবেন। আহার শুদ্ধ হলে মনও শুদ্ধ হয়। 'যেমন খাদ্য মনও তেমনই'। খাদ্য প্রধানত তিনভাবে পবিত্র হয়—সাত্ত্বিক উপার্জনে, পবিত্রভাবে তৈরি করায় এবং ভোজন সাত্ত্বিক হলে।

৯. কথার সংযমের দিকে খুব দৃষ্টি দেওয়া দরকার। সর্বদা চিন্তা করে কথা বলবেন। কথার তপস্যা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। দৃষ্টির সংযমেরও খুব প্রয়োজন। দৃষ্টিকে সাংসারিক বস্তুর দিকে যেতে দেবেন না, এরকম যদি সম্ভব না হয় তাহলে স্ত্রীলোকের দিকে যেন দৃষ্টির প্রবৃত্তি না হয়। যদি তা হয়, তাহলে উপবাস করবেন, এমন করলে ভাল ফল পাওয়া যেতে পারে। হাতেরও খুব সংযম করবেন, হাত দিয়ে যেন কোনো কামোদ্দীপক কুচেষ্টা না হয়। কাম প্রবৃত্তিকে মূল থেকে তুলে ফেলুন। ক্রোধকে এমনভাবে জয় করুন যাতে সম্মুখস্থ ব্যক্তি যতই উত্তেজিত হোক আপনি নিজে শান্ত থাকবেন।

১০. পরের উপকার করার অভ্যাস করা উচিত। আপনার দ্বারা কারো কিছু উপকার হলে সেটি খুবই মহৎকথা। কিন্তু সেই উপকার করা হবে উদারতা এবং দয়াবুদ্ধি থেকে।

১১. যে কোনো লোকের সঙ্গেই যে ব্যবহার করা হবে তাতে স্বার্থ-বুদ্ধি যেন না থাকে, স্বার্থের ফলে আচরণ খারাপ হয়ে যায়। স্বার্থকে ত্যাগ করলে আচরণ বা ব্যবহার সুসংস্কৃত হয়ে যায়।

১২. মানুষ ছোট ছোট জীবের প্রতি খুবই হিংসা করে। চলবার সময়, হাত ধোবার সময়, কুলকুচি করার সময় এবং মল-মূত্র ত্যাগ করবার সময় আমাদের এই কথাটি খুব মনে রাখা দরকার। আমরা এদের জীবনের কোনো মূল্য দিই না। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, এই উপেক্ষার কারণে প্রতিদানে আমাদের ঐ রকম নির্দয়তার পরিণাম ভুগতে হয়। যারা জীবের প্রতি হিংসার আইন প্রণয়ন করে তাদের নানারকম কষ্ট ভোগ করতে হবে।

কেউ যদি কুকুরকে খাদ্য দেওয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে তাকেও কুকুর হয়ে না খেয়ে মরতে হবে। কেউ যদি মিউনিসিপ্যালিটিতে কুকুরকে মারবার আইন প্রণয়ন করে তাহলে তাকেও কুকুর হয়ে নির্মমভাবে মৃত্যুর সম্মুখীন হতে হবে। কসাইদের তো খুবই দুর্দশা হবে। সেই রাজা ধন্য যার রাজ্যে হিংসা ছিল না।

১৩. সূর্যোদয়ের আগে প্রাতঃসন্ধ্যা এবং সূর্যাস্তের আগে সান্ধ্য-সন্ধ্যা নিয়মানুসারে শ্রদ্ধা ও যত্ন সহকারে করা উচিত। সন্ধ্যা-গায়ত্রী থেকে যে লাভ হয় তা আমরা বুঝতে পারি না। তার কারণ হলো আমাদের শ্রদ্ধা ও প্রেমের ঘাটতি।

১৪. ব্যবসায়ে এই নিয়ম করে নিন যে আপনারা মিথ্যা ও কপটতা করবেন না। খেতে না পেলে কোনো পরোয়া করবেন না। আমার এই বিশ্বাস যে, সত্য আচরণে যতটা কাজ হয় মিথ্যা-কপটতায় তা কখনো হতে পারে না। আগে মিথ্যা কথা বলে থাকলে শুরুতে লোকেরা বিশ্বাস করে না। তাতে ভাবনার কিছু নেই। প্রথমে যা করা হয়েছে তার জন্য প্রায়শ্চিত্ত তো করতে হবে। যদি এই সূত্রটি মনে রাখা হয় যে 'লোভই হল পাপের মূল' তাহলে আচরণে পাপ হতে পারে না।

১৫. আমাদের কাছে পথ-প্রদর্শকরূপে গীতা প্রভৃতি শাস্ত্র থাকা সত্ত্বেও যদি আমাদের দুর্গতি হয় তবে তা খুবই লজ্জার কথা। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার পতাকা উড্ডীন আছে, তাহলে আমাদের অবনতি কেন হবে ? আমাদের ভজনা করবার স্বাধীনতা আছে। তাহলে সংসারে ভগবানের নাম থাকা সত্ত্বেও কেন আমাদের দুর্গতি ?

১৬. কখনই কুসঙ্গ করা উচিত নয়। যেসব মানুষ বিষয়ী, পামর, দুরাচারী, পাপী এবং নাস্তিক তাদের কখনও সঙ্গ করবেন না এবং তাদের পাশেও বসবেন না। তাদের থেকে সর্বদা দূরে থাকবেন। তারা প্লেগের মতো। এজন্য তাদের আচরণ ও কুকার্যকে ঘৃণা করবেন, তবে তাদের ঘৃণা করবেন না।

১৭. কোনো রকম বিচার যদি করতে হয় তাহলে তা সমদৃষ্টিতে করবেন। যদি বৈষম্য করতে হয় তাহলে নিজের দিকে কম এবং বিপক্ষের দিকে বেশি রাখবেন।

১৮. যদি কোনো কঠিন কাজ উপস্থিত হয় তাহলে সেটিকে নিজে করবার জন্য প্রস্তুত হতে হবে।

১৯. লাভ-ক্ষতি, জয়-পরাজয় এবং সুখ-দুঃখাদিতে সমানরূপে ঈশ্বরের দয়া প্রত্যক্ষ করতে হবে।

২০. ঈশ্বর-প্রাপ্তি সম্পর্কে পূর্ণ বিশ্বাস রাখবেন। এইরকম ভাবনা জাগ্রত রাখুন যে আপনার আর কোনো আশ্রয় নেই ; কেবল ভগবানের দয়া দেখে আপনার ভরসা জন্মেছে যে তিনি অবশ্যই আপনার খবর নেবেন।

২১. সকল প্রকার বিষয়কে বিষতুল্য মনে করে সেগুলিকে ত্যাগ করা উচিত। বিষ মিশ্রিত মিষ্টি জিনিসও খাবার যোগ্য নয়। অনুরূপভাবে বিষয় সুখে যদি মন আকর্ষিত হয় তবে তাও ত্যাজ্য।

২২. জ্ঞান অথবা প্রেম কোনো একটি পথকে অবলম্বন করে উত্তরোত্তর উন্নতি করে যেতে হবে, গতকালের চেয়ে আজ কোনো না কোনো সাধনাকে বাড়িয়ে দিতে হবে। এইভাবে নিরন্তর উন্নতি করুন। চলতে-ফিরতে, উঠতে-বসতে কখনও এক মিনিটের জন্যও ভগবানকে ভুলবেন না। ভগবান বলেছেন—

তস্মাৎ সর্বেষু কালেষু মামনুস্মর যুধ্য চ॥

(গীতা ৮।৭)

অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ।

(গীতা ৮।১৪)

২৩. ভগবানের দয়া এবং ভালবাসাকে স্মরণে রেখে সব সময় ভগবৎপ্রেমে মুগ্ধ এবং নির্ভয়ে থাকতে হবে। ভগবৎ-চিন্তায় খুব শ্রদ্ধা ও প্রীতি বৃদ্ধি করুন। এটি খুবই মহার্ঘ জিনিস।

২৪. যারা কুতর্ক করে তাদের সঙ্গে কথা বলা উচিত নয়। নিজের

হৃদয়ের গূঢ় এবং মার্মিক কথা কাউকে বলা উচিত নয়।

২৫. নিজের গুণকে লুকিয়ে রাখবেন এবং কারও নিন্দা-স্তুতি করবেন না। যদি করতেই হয় তাহলে স্তুতি করবেন। নিজের নিন্দা করা যেতে পারে। একমাত্র পরমাত্মাই স্তুতির যোগ্য।

—— ০ ——

প্রকৃতি-পুরুষ নিয়ে আলোচনা

সংসারে কেবল দুটি পদার্থই আছে—জড় এবং চেতন। পুরুষ হলো চেতন আর প্রকৃতি হলো জড়। পুরুষ দ্রষ্টা, প্রকৃতি দৃশ্য। পুরুষ নির্বিকার, প্রকৃতি বিকাশশীল। এই দুটি পদার্থ সম্পূর্ণতঃ প্রত্যক্ষ। আমাদের সকলের মধ্যেই এই দুটির অবস্থান। এগুলির মধ্যে যারা দেখে তারা হলো দ্রষ্টা আর বাকি সব জগৎরূপে দর্শনীয় দৃশ্য।

যত জীব আছে তারা সকলেই পরমাত্মার অংশ। আগুনের স্ফুলিঙ্গ আগুন থেকে ভিন্ন নয়, আসলে দুটিই এক, তেমনই জীব পরমাত্মা থেকে ভিন্ন নয়। দৃশ্যও প্রকৃতির কার্য হওয়ায় তত্ত্বতঃ প্রকৃতিই। সেগুলি হলো প্রকৃতির বিকৃত রূপ।

কার্যকারণকর্তৃত্বে হেতুঃ প্রকৃতিরুচ্যতে। (গীতা ১৩।২০)

অর্থাৎ 'প্রকৃতিকে কার্য ও করণের উৎপত্তিতে হেতু বলা হয়েছে।' আকাশ প্রভৃতি পঞ্চ ভূত (তত্ত্ব) তথা শব্দ প্রভৃতি পাঁচটি বিষয় অর্থাৎ গুণ—এই দশটির নাম হলো কার্য। পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় তথা মন, বুদ্ধি এবং অহংকার—এই তেরটির নাম করণ। প্রকৃতি হলো এই সবের কারণ। অতএব প্রকৃতি থেকে উৎপন্ন হওয়ায় এই সমগ্র জগৎ প্রকৃতিরই স্বরূপ।

এবার প্রকৃতি ও পুরুষের সম্বন্ধ বুঝতে হবে। প্রকৃতি পুরুষের অংশ নয়, সে তার শক্তি। শক্তিও শক্তিমান থেকে ভিন্ন নয়।

যখন মহাপ্রলয় হয় তখন সমগ্র দৃশ্য-জগৎ প্রকৃতির মধ্যে একাকার হয়ে যায়। সেই সময় কেবল প্রকৃতিই থাকে। দৃশ্য-জগৎ আর থাকে না। বেদান্তে প্রকৃতিকে অনাদি, সান্ত এবং সাংখ্যে তাকে অনাদি, নিত্য বলে মনে করা হয়েছে। যোগেতেও তাকে এই রকমই বলা হয়েছে। যখন তা ক্রিয়ারূপে থাকে তখন তাকে দৃশ্যরূপে দেখা যায়। আর যখন অক্রিয়ারূপে থাকে তখন সেটি অব্যক্তরূপে থাকে। ব্যক্তরূপের উৎপত্তি নিম্ন প্রকারে হয়—

মূল প্রকৃতি থেকে মহত্তত্ত্ব উৎপন্ন হয়েছে, তাকেই সমষ্টি-বুদ্ধি বলে। সমষ্টি-বুদ্ধি থেকে সমষ্টি-অহংকার এবং সমষ্টি-অহংকার থেকে সমষ্টি-মন উৎপন্ন হয়। সেই অহংকার থেকেই শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস, গন্ধ—এই পাঁচটি সূক্ষ্ম তন্মাত্রা সৃষ্টি হয়েছে। এগুলিকে ইন্দ্রিয়গুলির কারণভূত অর্থ বলা হয়। কেউ কেউ এই সূক্ষ্ম তন্মাত্রাগুলির উৎপত্তি অহংকার থেকে হয়েছে বলে থাকেন। আবার কেউ কেউ বলে থাকেন মহত্তত্ত্ব থেকে হয়েছে, বস্তুত একই কথা। সমষ্টি-বুদ্ধি, সমষ্টি-অহংকার এবং সমষ্টি-মন—এই তিনটিই একই অন্তঃকরণের বিভিন্ন অবস্থার তিনটি নাম। এই পাঁচটি সূক্ষ্ম ভূত থেকে অর্থাৎ তন্মাত্রাগুলি থেকে পাঁচটি জ্ঞানেন্দ্রিয়, পাঁচটি কর্মেন্দ্রিয় এবং আকাশ প্রভৃতি পাঁচটি স্থূল ভূতের উৎপত্তি হয়ে থাকে। এইটিই হলো দৃশ্য-জগৎ।

এই বর্ণনা থেকে এই কথা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে প্রকৃতিই হলো এই দৃশ্য-জগতের কারণ। এই প্রকৃতির স্বরূপ কথার দ্বারা বোঝান যায় না। কেননা বাণী হলো তারই কার্য। সেইজন্য এই প্রকৃতি হলো অনির্বচনীয়। মন এবং বুদ্ধিও প্রকৃতির কার্য। তাই এরাও তাকে জানতে পারে না। এই জন্যই প্রকৃতি হলো অচিন্ত্য এবং অতর্ক্যও। এইভাবে যদিও তা বাণী এবং মন-বুদ্ধির বিষয় নয় তাহলেও তার অবস্থিতি তার কর্মরূপ এই দৃশ্য-জগতের দ্বারা স্পষ্ট হয়ে যায়।

প্রকৃতি এবং পুরুষ দুটিই ব্যাপক। কেননা কারণ সর্বদাই তার কার্যে ব্যাপকরূপে (ব্যাপ্ত) থাকে। বরফে জলের ব্যাপকতা যেমন স্পষ্ট বোঝা

যায় তেমনই প্রকৃতির ব্যাপকতাও স্পষ্ট বোঝা যায়, কিন্তু পুরুষের ব্যাপকতা অতি সূক্ষ্ম হওয়ার কারণে তাকে ততটা সহজে ও স্পষ্টরূপে বোঝা না গেলেও সেটি প্রকৃতি অপেক্ষা বিশেষ ব্যাপক। প্রকৃতি তো কারণই। কিন্তু পুরুষ—ঈশ্বর মহাকারণ। এই সংসার তাঁর দ্বারাই ধৃত।

প্রকৃতি এবং কার্যে এই মহাকারণ ঈশ্বর সর্বত্র পরিপূর্ণ রয়েছেন। উপরে বলা হয়েছে যে কারণ তার কার্যে সর্বদা ব্যাপক থাকে। আকাশের দ্বারা বায়ু সৃষ্ট হয়েছে। এজন্য তার মধ্যে আকাশ ব্যাপ্ত হয়ে আছে। বায়ু থেকে তেজের উৎপত্তি, তাই তেজে বায়ু এবং আকাশ দুটিই ব্যাপ্ত। তেজ থেকে জল এবং জল থেকে পৃথিবীর উৎপত্তি। তাই পৃথিবীতে আকাশ, বায়ু, তেজ এবং জল—এই চারটি তত্ত্ব পরিপূর্ণ হয়ে আছে। অনুরূপভাবে এই সব কিছুর কারণরূপা প্রকৃতি এই সবের মধ্যে ব্যাপক হয়ে আছে। কিন্তু এই প্রকৃতি সেই শক্তিমান পুরুষের শক্তিমাত্র। সেজন্য সকলের মহাকারণ সেই চেতন পুরুষ এই জড় প্রকৃতি এবং তার কার্যরূপ এই সমগ্র দৃশ্য সংসারে ব্যাপ্ত রয়েছেন।

এখন এটি বুঝতে হবে যে ঈশ্বর-চেতন-পুরুষ এই সৃষ্টির উপাদান কারণ, নাকি নিমিত্ত কারণ। বস্তুত এই পুরুষ হলেন সৃষ্টির নিমিত্ত কারণ এবং উপাদান কারণ—দুটিই। ভগবান গীতায় বলেছেন—

চাতুর্বর্ণ্যং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশঃ। (৪।১৩)

অর্থাৎ 'ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র—এই চারটি বর্ণকে আমি তাদের গুণ ও কর্মের বিভাগ অনুসারে সৃষ্টি করেছি।' এখানে ভগবান নিজেকে নিমিত্ত কারণ বলেছেন ; কিন্তু

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। (গীতা ৯।১০)

—এই কথায় তিনি প্রকৃতিকে নিমিত্ত-কারণ বলেছেন। তাহলে দুটি নিমিত্তকারণ হলো কীকরে ? এর উত্তর হলো এই যে, চেতন পুরুষকে মুখ্যরূপে গ্রহণ করে নিয়ে তার অধ্যক্ষতায় যখন প্রকৃতি সৃষ্টি রচনা করে তখন বাস্তবে ঈশ্বরই তার রচয়িতা হয়ে যান। প্রকৃতি তো মাধ্যম মাত্র।

অতএব প্রকৃতপক্ষে ঈশ্বরই এই সৃষ্টির নিমিত্ত-কারণ। আর চেতন-ঈশ্বরকে নিমিত্ত-কারণ মেনে নিতে প্রায় সকলেই একমত। উপাদান-কারণ সম্পর্কে কিছু মতভেদ আছে। কিন্তু চিন্তা করলে এইটিই সিদ্ধ হয় যে জ্ঞান ও ভক্তি—উভয় সিদ্ধান্ত অনুসারেও দুটির উপাদান-কারণও ঈশ্বর। জ্ঞানের সিদ্ধান্ত অনুসারে এটি বোঝা উচিত যে যেখানে স্বপ্নে স্বপ্নদ্রষ্টা মানুষ নিজের মধ্যেই নিজেরই কল্পনার দ্বারা স্বয়ং সংসার হয়ে যায় এবং নিজেই নিজেকে দেখে সেখানে সেই চেতন দ্রষ্টা ছাড়া সেই স্বপ্নের জগতে অন্য কোনো উপাদান-কারণ থাকে না। তেমনই যেখানে মোহের কারণে গুণগুলির সঙ্গে প্রকৃতির প্রতীতি হয় সেখানে প্রকৃতপক্ষে পরমাত্মার অতিরিক্ত আর কিছুই নেই।

পরমাত্মাতেই প্রকৃতি আপন কর্মসহ সন্নিবিষ্ট আছে। ভক্তির সিদ্ধান্ত থেকে একথা মেনে নিতে হবে যে প্রকৃতি হলো পরমাত্মার শক্তি এবং শক্তি কখনো শক্তিমান থেকে আলাদা হতে পারে না। এই যা কিছু দৃশ্য তা সবই পরমাত্মার শক্তিরূপ প্রকৃতিরই বিস্তার। সেজন্য প্রকৃতপক্ষে এটি পরমাত্মারই স্বরূপ। অতএব পরমাত্মাই এর উপাদান-কারণ। গীতাতে **'বাসুদেবঃ সর্বমিতি'**, **'ময়া ততমিদং সর্বম্'**, **'মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি'**, **'যতঃ প্রবৃত্তির্ভূতানাং যেন সর্বমিদং ততম্'**, **'অহং সর্বস্য প্রভবো মত্তঃ সর্বং প্রবর্ততে'** প্রভৃতির দ্বারা ঈশ্বরের অভিন্ন নিমিত্তোপাদানকারণ হওয়া স্পষ্ট প্রমাণিত হয়।

এখানে এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে ঈশ্বর যদি কর্তা হন তাহলে তাঁর মধ্যে কর্তৃত্বভাব এসে গিয়েছে! এর উত্তর হলো বাস্তবে ঈশ্বর কর্তা নন, তিনি অকর্তা—

তস্য কর্তারমপি মাং বিদ্ধ্যকর্তারমব্যয়ম্॥ (গীতা ৪।১৩)

ভগবান বলেন যে 'সেই চাতুর্বর্ণের রচয়িতা হওয়ায় অবিনাশী আমাকে তুমি অকর্তা বলেই জানবে।'

পুরুষকেই আত্মা বলা হয়। পুরুষ সম্পর্কে সাংখ্যদর্শনের অভিমত হল

পুরুষ অনেক। যোগদর্শনও পুরুষকে অনেক বলে মেনেছে। কিন্তু তা পুরুষ বিশেষকে ঈশ্বর বলেও মানে। এতে জীব অনেক আর বিশেষ পুরুষ একজনই ঈশ্বর। পূর্ব মীমাংসাও ঈশ্বরকে অনেক বলেছে। বৈশেষিক এবং ন্যায় পুরুষের দুটি ভিন্নতাকে মানে। জীবাত্মা এবং পরমাত্মা। বেদান্ত পুরুষকে অনেক মনে না করে 'এক' বলে জানে। সব সিদ্ধান্তবাদীরা (যে কোনো রূপেই) আত্মা— পুরুষকে চেতন বলেই মেনে নিয়েছে। এইভাবে নিজের নিজের সিদ্ধান্ত অনুসারে সকলেরই এক অথবা অনেক বলে মেনে নেওয়া যুক্তিযুক্ত, কেননা সকলের লক্ষ্য আত্মার কল্যাণ। আর আত্মার কল্যাণকারক হওয়ায় সকলের কথাই ঠিক। এক অথবা অনেক যাই মানা হোক, দুটি প্রকারেই সাধনা করলে আত্মতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান হয়ে যায় এবং পুরুষ মুক্ত হয়ে যায়। মুক্ত হওয়ার পরবর্তীকালে আত্মার স্বরূপকে কেউ কোনোভাবেই বর্ণনা করতে পারে না। কেননা সেটি হলো অনির্বচনীয় স্থিতি। অতএব প্রকৃতপক্ষে কথা হলো এই যে, যে এটি লাভ করে সে তার স্বরূপ কেমন তা অবশ্যই বুঝতে পারে। যতক্ষণ পর্যন্ত পরমাত্মাকে পাওয়া না যাচ্ছে ততক্ষণ মানুষের পক্ষে নিম্নলিখিতভাবে মান্যতা নিয়ে চলা সুগম এবং উত্তম।

পুরুষের সম্পর্কে এটি মেনে নিতে হবে যে তার দুটি প্রকার আছে— জীবাত্মা ও পরমাত্মা। জীবাত্মা অনেক এবং পরমাত্মা এক। পরমাত্মা এক হলেও তাঁর দুটি প্রকার আছে—একটি হলো সগুণ আর অন্যটি হলো নির্গুণ। সত্ত্ব, রজ ও তম এই তিনটি গুণকে সৃষ্টিকারী প্রকৃতির সঙ্গে পরমাত্মার যে স্বরূপ সেইটিই হলো সগুণ। অর্থাৎ যা গুণগুলির সঙ্গে সম্মিলিত সেটি হলো সগুণ, অর্থাৎ যা গুণান্বিত সেইটিই হলো সগুণ। এটি মনে রাখতে হবে যে পরমাত্মা বস্তুতঃ সগুণ এবং নির্গুণ দুটি নন। দুটির সামগ্রিক রূপ হলো পরমাত্মা। যেমন, আকাশের কোনো এক অংশে বায়ু, তেজ, জল, পৃথিবী মিলিতভাবে থাকলে তাকে আমরা চারটি ভূত সহ আকাশ বলি আবার এই চারটি ভূত থেকে স্বতন্ত্র থাকলে তাকেও আমরা

আকাশ বলি।

আকাশ বায়ু প্রভৃতির আধার, তার কারণ এবং তা সর্বত্র ব্যাপক। তেমনই পরমাত্মা সমস্ত ভূতের আধার, কারণ এবং চরাচরে সর্বত্র ব্যাপক। এই বিষয়টিকে আর একবার বুঝে নিতে হবে। যেমন আকাশে মেঘ থাকে। তার সৃষ্টি আকাশে এবং তা আকাশেই অবস্থিত আর সে আকাশেই বিলীন হয়ে যায়। এইভাবে বায়ু, তেজ, জল এবং পৃথিবী প্রভৃতির সৃষ্টি আকাশ থেকে হয়েছে, এগুলি আকাশে অবস্থিত এবং আকাশেই ক্রমশ বিলীন হয়ে যায়। অতএব এদের সৃষ্টি আকাশের কার্য হওয়ায় আকাশ হলো এদের কারণ এবং এগুলি হলো আকাশের কার্য। কার্য ব্যাপ্য আর কারণ ব্যাপক হয়ে থাকে। এজন্য আকাশ এদের মধ্যে ব্যাপক আর এইসবগুলির স্থিতি আকাশে হওয়ায় আকাশই হলো এদের আধার। আকাশ প্রভৃতি এই সমস্ত ভূতের প্রধান কারণ প্রকৃতি হওয়ায় প্রকৃতি হলো এদের কারণ, প্রকৃতিই সমস্ত দৃশ্যবস্তুতে ব্যাপক। প্রকৃতির আধারেই এই সবগুলি স্থিত। প্রকৃতি পরমাত্মার শক্তি। পরমাত্মা প্রকৃতির পরম আধার হওয়ায় প্রকৃতিসহ সমগ্র বিশ্বের তিনিই মহাকারণ। পরমাত্মাই এতে ব্যাপক এবং পরমাত্মাই এর একমাত্র আধার।

এই জগৎ চরাচরের সঙ্গে যে পরমাত্মার স্বরূপ তিনি সগুণ আর এর অতীত যেখানে চরাচর নেই, যেখানে কেবল তিনিই আছেন, সেখানে তিনি গুণাতীত। সগুণেরও দুটি প্রকার আছে—সাকার এবং নিরাকার। যেমন পৃথিবীরও দুটি প্রকার আছে—গন্ধ হলো নিরাকার এবং ফুল হলো সাকার। যেমন অগ্নি অপ্রকটরূপে নিরাকার এবং প্রকটরূপে সাকার, যেমন জল আকাশে পরমাণুরূপে নিরাকার কিন্তু মেঘ বিন্দু এবং তরল অবস্থায় সাকার। সেই নিরাকার জলই সাকাররূপে প্রকট হয়। এই রকমভাবেই সর্বব্যাপী সগুণ পরমাত্মা নিরাকাররূপে থেকেও সাকাররূপেও গুণমসহ সংসারে প্রকট হন। যেমন তেজ, জল, পৃথ্বীর নিরাকার এবং সাকার দুটি রূপ পৃথক মনে হলেও বস্তুত একটিই। এদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। তেমনই

পরমাত্মার নির্গুণ নিরাকার, সগুণ নিরাকার এবং সগুণ সাকার রূপের মধ্যে কোনো ভেদ নেই। সব কিছু মিলেই এক সমগ্র রূপ বিদ্যমান। এই কথাকেই 'সাধিভূতাধিদৈবং মাং সাধিযজ্ঞং চ যে বিদুঃ' প্রভৃতির দ্বারা ভগবান নিষ্পন্ন করেছেন (গীতা ৭।৩০)। এরই নাম সমগ্র ব্রহ্ম। এইটিই পুরুষোত্তম। প্রভুর এই যে স্বরূপ এইটিই উপাসনাযোগ্য। যদি কোনো পুরুষ সগুণকে ছেড়ে কেবল নির্গুণকে উপাসনা করে সেও সেই পরমেশ্বরকেই উপাসনা করে। সগুণের মধ্যেও যে নিরাকার অথবা সাকার যে কোনো রূপকেই উপাসনা করে সেও পরমেশ্বরকেই উপাসনা করে। আর এইভাবে যারা উপাসনা করে সেই সব উপাসকই অন্তিমে সেই পরমাত্মাকেই লাভ করেন। কিন্তু যিনি ব্রহ্মের এই সামগ্রিক রূপকে ভালভাবে বুঝে নিয়ে উপাসনা করেন তিনি সর্বোত্তম। কেননা তিনি সহজেই এবং খুবই তাড়াতাড়ি পরমাত্মাকে লাভ করেন। যদি বলা হয় যে তাহলে জীবাত্মা ও পরমাত্মার মধ্যে কোথায় ভিন্নতা তাহলে তার উত্তর হলো এই যে জীবাত্মা হলো উপাসক এবং পরমাত্মা হলেন উপাস্য। পরমাত্মা রাগ- দ্বেষাদি অবগুণ, পুণ্য-পাপাদি কর্ম এবং সুখ-দুঃখ প্রভৃতি বিকার থেকে সব সময় ও সম্পূর্ণরূপে মুক্ত । আর অজ্ঞতার কারণে এই সবগুলিই জীবের সঙ্গে সম্বন্ধিত। প্রভুর কৃপায় প্রভুর তত্ত্বের জ্ঞান হয়ে গেলে এই সব কিছুর সঙ্গে সম্বন্ধ ছিন্ন হতে পারে। এই সব কিছুই আছে অজ্ঞতার কারণে আর প্রভুর তত্ত্বজ্ঞানের দ্বারা এই গুলির অবসান হয়। প্রভুর তত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান কর্মযোগ, ভক্তিযোগ, জ্ঞানযোগ প্রভৃতির দ্বারা হয়।

যদি প্রশ্ন করা হয় যে পরমার্থতত্ত্বের যথার্থ জ্ঞান হওয়ার পরে ভেদ থাকে, না অভেদ থাকে ? তাহলে তার উত্তর হলো এই যে সাধক যেমন বোঝেন সেই রকমই তাঁর প্রতীতি হয়। বলা যেতে পারে যে যতক্ষণ প্রতীতি থাকে ততক্ষণ তো তার সেই ধারণাই থাকে। এই দুটির যা ফল, যাকে পরমতত্ত্ব প্রাপ্তি, পরমাত্মাকে প্রাপ্তি বলা যায়, যাকে বেদ অনির্বচনীয় স্থিতি বলেছে, সেই স্থিতির পরের কথা যদি আমারা জানতে চাই তো তার উত্তর হলো এই

যে, যে স্থিতিকে অনির্বচনীয় বলেছে তাকে অন্যে আর কী বলতে পারে ? তাহলে এই কথা বুঝতে হবে যে এই স্থিতিকে বলা যায় না। যদি বলা হয় যে ওই স্থিতিকে যখন বলা যায় না তাহলে তার অস্তিত্বের প্রমাণ কী ? এর উত্তরে বলা যাবে যে তার জন্য প্রমাণের প্রয়োজন নেই। তা স্বতঃ প্রমাণিত। তার পক্ষে সব চেয়ে বড় কথা হলো এই যে সকল প্রমাণের এবং সব কিছুর অস্তিত্ব তার দ্বারাই সিদ্ধ হয়। বেদ, শাস্ত্র এবং মহাত্মাদের অভিজ্ঞতা তাকে প্রত্যক্ষভাবে জানায়। সকল বেদের প্রধান লক্ষ্য হলো তাঁর প্রাপ্তি, সেইটিই অনির্বচনীয় বস্তু।

তিনি হলেন পুরুষ এবং তাঁর শক্তি হলো প্রকৃতি। তিনটি গুণই সেই প্রকৃতির কার্য (কাজ)। বেদান্ত এবং সাংখ্য প্রকৃতিকে তিনটি গুণের সাম্যাবস্থা বলে মেনেছে। তিনটি গুণের সাম্যাবস্থাকেই তার স্বরূপ বলে মেনেছে। কিন্তু ভগবান গীতাতে গুণগুলিকে প্রকৃতির কাজ বলেছেন। যেমন—

'প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ' (৩।৫)
'গুণান্.....বিদ্ধি প্রকৃতিসম্ভবান্' (১৩।১৯)
'প্রকৃতিজান্ গুণান্' (১৩।২১)
'গুণাঃ প্রকৃতিসম্ভবাঃ' (১৪।৫)
'প্রকৃতিজৈঃ ত্রিভিঃ গুণৈঃ' (১৮।৪০)

'বেদান্ত' প্রকৃতিকে অনাদি এবং সান্ত বলে মানে। সাংখ্য এবং যোগ প্রকৃতিকে অনাদি এবং নিত্য মনে করে। ভগবান গীতায় প্রকৃতিকে অনাদি বলেছেন কিন্তু নিত্য বলেননি। এক সনাতন চেতন অব্যক্তকেই নিত্য বস্তু বলেছেন—(৮।২০)। ভগবান প্রকৃতিকে সান্ত এবং অনিত্যও বলেননি, এইজন্য একে অনির্বচনীয় বলেই মনে করা উচিত। ভগবান প্রথমত প্রকৃতিকে নিত্য এইজন্যই বলেননি যে এক অনাদি, সনাতন, অব্যক্ত পরমাত্মাই তো নিত্য বস্তু। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতিকে নিত্য বললে জ্ঞানমার্গের সিদ্ধি হয় না। এইভাবে প্রথমতঃ ভগবান প্রকৃকিে অনিত্য এইজন্য বলেননি

যে মহাপ্রলয়ের সময় সমস্ত দৃশ্যবস্তু প্রকৃতিতে বিলীন হয়ে গেলেও প্রকৃতি থেকে যায় আর মহাসর্গের আদিতে সেই প্রকৃতি থেকেই পরমাত্মার সত্তাস্ফূর্তিতে আবার দৃশ্যের সৃষ্টি হয় ; তাতে তাঁকে নিত্য বলে মনে করা যেতে পারে। দ্বিতীয়ত, প্রকৃতিকে যদি অনাদি ও সান্ত (বা অনিত্য) বলে দেওয়া হোত তাহলে ভক্তিমার্গের গুরুত্বই বা কী থাকত ? ভগবানের দুটি মার্গই অভিপ্রেত আর সেজন্য তিনি প্রকৃতিকে স্পষ্ট করে নিত্যও বলেননি, অনিত্যও বলেননি।

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে প্রকৃতি হলো অনির্বচনীয়। পরমাত্মার তত্ত্বের জ্ঞান হয়ে যাবার পর তো যোগ এবং সাংখ্য অনুসারেও চেতন জীবাত্মার সঙ্গে প্রকৃতির একেবারেই সম্বন্ধ-বিচ্ছেদ হয়ে যায়। যাইহোক, সকল সিদ্ধান্তানুসারে আত্মতত্ত্বের সাক্ষাৎকার হয়ে যাবার পর 'একমাত্র বা উৎকৃষ্ট' অবস্থাই থেকে যায়। অর্থাৎ কার্যসহ এই প্রকৃতির সঙ্গে আর কোনো সম্বন্ধ থাকে না। বেদান্ত বলে যে এক বিজ্ঞানানন্দময় ব্রহ্মের অতিরিক্ত আর কোনো বস্তুই নেই। সাংখ্য এবং যোগ বলে আত্মতত্ত্বের উত্তরকালেও প্রকৃতি থাকে বটে কিন্তু যাঁর আত্মার সাক্ষাৎকার হয়ে গিয়েছে তাঁর প্রকৃতির সঙ্গে কোনো সম্বন্ধ থাকে না। বস্তুত পরিণামে একই কথা। সাক্ষাৎকার হয়ে যাবার পর প্রকৃতির সঙ্গে সম্বন্ধ কেউ মানে না আর যখন সম্বন্ধই থাকে না তখন তা যদি থাকেও তাতে কারও আপত্তি হয় না, আর না থাকলেও আপত্তি নেই। স্বপ্ন থেকে জেগে ওঠার পর সংসারের সঙ্গে স্বপ্নের কোনো সম্বন্ধ থাকে না। তাতে সেই স্বপ্নের সংসার যদি কোথাও থাকেও তাতে আপত্তি কিসের ? এতে এইটিই প্রমাণিত হয় যে যতক্ষণ পর্যন্ত সংসারের প্রতীতি থাকে এবং তার সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে ততক্ষণ চেতন ও জড় অথবা দ্রষ্টা ও দৃশ্য কিংবা জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় নামক পুরুষ ও প্রকৃতি দুটি পদার্থ থাকে এবং সেগুলি থেকেই সকলের বিস্তার হয়। কিন্তু যখন সংসারের প্রতীতি থাকে না, সংসারের সঙ্গে চিরকালের জন্য সম্বন্ধ বিচ্ছেদ হয়ে যায় তখন পরমাত্মার প্রাপ্তি হয়। তার পরের অবস্থার বর্ণনা কেউ করতে পারে

না। অতএব আসল কথা হল এই যে যাঁর পরমাত্মার প্রাপ্তি ঘটে তিনিই সেই অবস্থাকে যথার্থভাবে জানেন। তাই আমাদের পরমাত্মাকে পাওয়ার জন্য জোরদার চেষ্টা করা উচিত।

—— ০ ——

শ্রদ্ধা-বিশ্বাস এবং প্রেম

প্রশ্ন—ভগবান এবং মহাত্মাদের প্রভাব এবং গুণের কথা শুনেও শ্রদ্ধা-বিশ্বাস হয় না এবং তাঁদের কথা মতো চলতে তৎপরতার সঙ্গে চেষ্টা হয় না— এর কারণ কী ?

উত্তর—ভগবান এবং মহাপুরুষদের প্রভাব এবং গুণের কথা শুনেও শ্রদ্ধা না হওয়ার কারণ হলো অন্তঃকরণের মলিনতা এবং তদনুকূল চেষ্টা না করার কারণ হলো শ্রদ্ধার অভাব। অন্তঃকরণের অনুরূপ শ্রদ্ধা হয়ে থাকে। ভগবান বলেছেন—

সত্ত্বানুরূপা সর্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥

(গীতা ১৭।৩)

'হে ভারত ! সকল মানুষেরই শ্রদ্ধা তাদের অন্তঃকরণের অনুরূপে হয়ে থাকে। মানুষ শ্রদ্ধাশীল। তাই যে মানুষ যেমন শ্রদ্ধাশীল সে নিজেও তেমনই। অর্থাৎ যার যেমন শ্রদ্ধা তার স্বরূপও তেমনই।'

অন্তঃকরণের মলিনতা দূর হলে উত্তম শ্রদ্ধা হয় আর শ্রদ্ধা হলে তৎপরতা আসে।

শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।

(৪।৩৯)

অন্তঃকরণের মালিন্য দূর করায় বর্তমানে সবচেয়ে বড় উপায় হল

ভগবানের নাম জপ করা। তাই যেভাবেই হোক, জোর করে বা ভালবেসে নাম জপ করতে থাকুন। নাম জপ করলে অন্তঃকরণের মালিন্য দূর হয়ে যাবে। তাতে সাত্ত্বিক শ্রদ্ধা জাগ্রত হবে আর তখন ভগবান এবং মহাপুরুষদের প্রতি নিজে থেকেই শ্রদ্ধা এসে যাবে এবং তাঁদের কথা অনুযায়ী তৎপরতার সঙ্গে চেষ্টা হতে থাকবে।

প্রশ্ন—সৎসঙ্গ করি কিন্তু মনের যেমন হওয়া উচিত তেমন হয় না—এর কারণ কী ?

উত্তর—এতেও সৎসঙ্গের প্রভাবকে না জানা এবং অন্তঃকরণের মলিনতাই হলো কারণ। অন্তঃকরণ মলিন হলে সৎসঙ্গের রং লাগে না। ময়লা কাপড় রং-এ ডোবালে তাতে ভাল করে রং লাগে না। পরিষ্কার থাকলে রং ভাল করে লাগে। (প্রেম, আসক্তি, রুচি, আকর্ষণ—এই সব কিছুর অর্থ এক)। পরশ পাথরের ছোঁয়ায় লোহা সোনা হয়ে যায়। এই কথা সত্য। কিন্তু মাঝখানে যদি ব্যবধান থাকে তাহলে তা সোনা হয় না, এইভাবে মহাত্মাদের সঙ্গ থেকে রং লাগে কিন্তু যদি অবিশ্বাসের ব্যবধান থাকে তো তা লাগে না। যার পূর্ণ বিশ্বাস থাকে তার রং লাগবেই।

ভগবান ন্যায়দায়ক, সর্বজ্ঞ, সর্বশক্তিমান—এই বিশ্বাস যখন আমাদের হয়ে যাবে তখন আমরা একটা পাপও করতে পারি না। ঈশ্বরের সত্তা মেনে নিলেই পাপের বিনাশ হয়। যদি মানার পরেও পাপ করেন তো মনে করতে হবে যে, কেবল এক অংশেই মেনেছেন, পূর্ণ বিশ্বাস নেই। যে কাজে সরকার প্রসন্ন হয় না অর্থাৎ যে কাজ সরকারের প্রতিকূল সেই কাজ আমরা করি না। এই সরকার সর্বব্যাপক, সর্বজ্ঞ এবং সর্বশক্তিমান নন। পরমাত্মা সর্বজ্ঞ, সর্বত্র বিরাজমান এবং সর্বসমর্থ। যে কেউই তাঁকে সর্বজ্ঞ মনে করেন তিনি পাপ করতে পারেন না।

প্রশ্ন— যেমন বাবা ছেলেকে অনুচিত কাজ করতে জোর করে বাধা দেন, ঈশ্বরের তেমনভাবে বারণ করা উচিত। কিন্তু তিনি তা কেন করেন না ?

উত্তর—বারণ করেন—মহাপুরুষদের দিয়ে—মনের দ্বারা। সব রকমভাবেই বারণ করেন। কিন্তু ঈশ্বর জীবদের স্বাধীনতা দিয়েছেন, এইজন্য পরাধীন হয়েও স্বাধীন। যেমন, আমাদের বন্দুক রাখার লাইসেন্স আছে। আমরা রাজ্যের আইন মেনে বন্দুক চালাতে পারি। আইনের দ্বারা বৈধ। কিন্তু তাহলেও আমারা যাকে খুশি গুলি করতে পারি, শাস্তি যাই হোক, এখানেও সেই একই কথা।

প্রশ্ন—যখন কোনো কথা দু'এক মিনিটের জন্য বোধগম্য হয়, সেই কথা টিকে থাকে না কেন ? ঈশ্বরের তো উচিত তাকে আটকে রাখা—এইটুকু সহায়তা তো তাঁর করা উচিত ।

উত্তর—যে ভগবানের কাছ থেকে সহায়তা চায় সে তা পায়। যে এই প্রার্থনা করে যে, 'হে ভগবান ! আমার মন যেন সব সময় পূজা ও ধ্যানে নিমগ্ন থাকে।' তাকে ভগবান সহয়তা করেন। সাধারণভাবে সহায়তা তো সকলেই পেয়ে থাকে। কিন্তু যে বিশেষ সাহায্য চায়, সে তাও পেয়ে থাকে। তাই যাতে অবস্থা বদলে না যায় তার জন্য তাঁর কাছে প্রার্থনা করা উচিত। যে একথা বিশ্বাস করে, যে ভগবানের শরণাগত, তার চিন্তাকে দৃঢ় এবং অন্তঃকরণকে পবিত্র ভগবানই করেন, তার তা হয়ে যায়। এক ব্যক্তি চান যে তিনি তাঁর আদেশানুসারে চেষ্টা করবেন ; কখনও কখনও তা করেও থাকেন, কিন্তু সুযোগ এলেই পিছিয়ে পড়েন। এতে মনে করে নিতে হবে যে, তাঁর এই বিশ্বাস নেই যে প্রাণ যায় সেও ভাল তবু তাঁর আদেশ পালন করা উচিত। যদি ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস নিয়ে তাঁর সাহায্য চাওয়া হয় তাহলে ভগবান তাঁকে সাহায্য করবেনই।

প্রশ্ন—শ্রদ্ধা, প্রেম ও দয়া সম্পর্কে বিশেষ করে কিছু বলুন।

উত্তর—মনে হচ্ছে যে আমার কথা বলার অভ্যাস হয়েছে আর আপনাদের হয়েছে শুনে যাবার অভ্যাস। বারবার বলা হয়, আপনারাও শোনেন। কিন্তু যতক্ষণ পর্যন্ত তা বোঝা না যায়, কাজে প্রবৃত্ত করা না হয় ততক্ষণ তা নতুন থাকে এবং তা বারবার শোনার প্রয়োজন থাকে।

কথা তো খুবই ভাল। এতে কোনো খরচ হয় না। প্রচণ্ড মূর্খও এই কাজ করতে পারে। এতে শক্তি, বুদ্ধি, ধন, জাতি, বর্ণ বা কুল কোনো কিছুরই দরকার হয় না। এটি সাধনার সময়েও প্রত্যক্ষ শান্তি দান করে। তাহলে শুনবার পরেও যদি একে কার্যান্বিত করা না হয় তাহলে বুঝতে হবে যে বিশ্বাসে ঘাটতি আছে। সংসারে যা প্রত্যক্ষরূপে সুখ-শান্তি দেয় তাকে তো লোকেরা পালন করতে প্রস্তুত থাকে। আর এটি তো আদি, মধ্য এবং অন্তে সর্বত্র আনন্দদায়ক। এখন শুরু করুন, শান্তি আনন্দও এখনই প্রস্তুত আছে। এমন নয় যে আনন্দ কয়েক ঘণ্টা পরে পাওয়া যাবে।

কথা হলো এই—প্রথমে এই বিশ্বাস করে নিতে হবে যে পরমাত্মাকে দেখা না গেলেও তিনি আছেন এবং সর্বত্র আছেন। যেমন, ভূতকে দেখা যায় না তবু তা আছে—এই রকম মিথ্যা কল্পনা করেও মানুষ ভয়ে ভীত হয় এবং দুঃখী হয়ে যায়। তাহলে প্রকৃত ধারণা হলে সুখ ও শান্তি যে পাওয়া যাবেই তাতে সন্দেহ কী ? তাই পরমাত্মাকে দেখা না গেলেও মেনে নিতে হবে যে তিনি অবশ্যই আছেন।

ঈশ্বর দয়ালু এবং প্রেমিক। তাঁর দয়া এবং প্রেম সর্বত্র পরিপূর্ণ। প্রতিটি অণুতে তাঁর দয়া ও প্রেমকে প্রত্যক্ষ করে সুখ ও শান্তিকে দেখে আমাদের মুগ্ধ হওয়া উচিত। একে সাধন করে নিতে হবে। এতে কোনো পরিশ্রম নেই, অন্য কোনো জিনিসেরও প্রয়োজন নেই।

ঈশ্বরের দয়া ও প্রেম অপার, অসীম। এই কথা মনে রাখলে ঈশ্বরের স্মরণ নিরন্তর জাগরুক থাকবে। তাঁর দয়া এবং প্রেম সর্বত্র পরিপূর্ণ যেমন মেঘে জল সর্বত্র ভরা থাকে। দয়া এবং প্রেমের বিশাল সাগর উচ্ছলিত হয়ে আছে, পরিপূর্ণ হয়ে আছে। তার মধ্যে নিজেরাই নিজেদের নিমজ্জিত করো। চারিদিকে—বাইরে-ভিতরে, উপরে-নিচে সর্বত্র ঈশ্বরের দয়া ও প্রেমের সমুদ্র পূর্ণ রয়েছে। যেমন সূর্যের রোদ্দুরে আমরা অবগাহন করি—আমাদের চারিদিকে রোদ্দুর ভরে আছে। তেমনই পরমাত্মার দয়া এবং প্রেম সর্বত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছে। সূর্যের কিরণ তো কেবল বাইরেই থাকে। কিন্তু

দয়া এবং প্রেম তো ভিতর-বাহির সর্বত্র ভর্তি হয়ে আছে। এই সব প্রত্যক্ষ করে আমাদের মুগ্ধ হয়ে থাকা উচিত। আহা ! আমরা ধন্য। আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কত বেশি দয়া। সকল দেশে, সকল কালে, সকল বস্তুতে ঈশ্বরের দয়া দর্শন করুন এবং এইভাবে প্রেম বিকশিত করুন।

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি। (গীতা ৫।২৯)

ঈশ্বর পরম সুহৃদ। সুহৃদ কথার অর্থ কী ? যার মধ্যে দয়া এবং প্রেম থাকে তার নাম সুহৃদ। তাঁর দয়া এবং প্রেম অনন্ত, অপার। অণু-পরমাণুতে, সূক্ষ্মাতি-সূক্ষ্ম পরমাণুতে তা পরিব্যাপ্ত। কোনো রাজার দয়া পেলে আনন্দের সীমা থাকে না। আর ঈশ্বরের দয়া তো অপার। তাহলে আর কথা কী ? (সহজেই আমাদের অবস্থা বদলে যায়। আমরা খুব তাড়াতাড়ি পরমাত্মাকে পেতে পারি।) সব সময় এই কথা মনে রাখতে হবে। আহা ! আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কতই না দয়া ! আমাদের প্রতি ঈশ্বরের কত ভালবাসা। সকলের প্রতি সমানভাবে অপার দয়া। এতই যখন দয়া তাহলে আমাদের ভয়, চিন্তা, শোক করবার প্রয়োজন কী ? আমরা ভয় চিন্তা করব এতো আমাদের মূর্খতা। ভয় কাকে ! ওখানে ভয়, চিন্তা, মোহ নেই। এ আমাদের নির্বুদ্ধিতা। আমরা জানতাম না যে প্রভু এত দয়ালু। এখন আর চিন্তা কিসের ? ভয় কাকে ? শোক কোথায় ? প্রভুর দয়া অপার। একেই সাধন করে নাও। সব সময় যদি এটি মনে রাখ, মনে এই রকম অনুভূতি থাকে, তাহলে শান্তি ও আনন্দের ভাণ্ডার দেখতে পাবে। এই সাধনের দ্বারা অল্প সময়েই সাক্ষাৎ প্রভুকে প্রাপ্ত করা যায়।

একজন ধনশালী মানুষ স্বপ্নে ভিখারী হয়ে গিয়েছিল। তাতে সে দুঃখিত হয়েছিল। কিন্তু জেগে ওঠার পর আর দুঃখ নেই। দুঃখ ছিলই না। বিনা কারণেই সে দুঃখকে মেনে নিয়েছিল। এইভাবে আমরাও বোকার মতো দুঃখিত হচ্ছি। ঈশ্বরের দয়া আর প্রেম তো সর্বত্র পরিপূর্ণ হয়ে আছে। আমরা মানি না তাই দুঃখিত হই। কিন্তু আমরা না মানলেও ঈশ্বরের দয়া তখনও থাকে। যদি মেনে নেন তাহলে কেবলই আনন্দ। এমন অমৃতময় আনন্দ তো

সামনে রয়েছে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তাহলে কেন তাকে ছেড়ে দেন ? '**প্রত্যক্ষে কিং প্রমাণম্**'—প্রত্যক্ষ আনন্দের অভিজ্ঞতা রয়েছে, তাহলে আর প্রমাণের প্রয়োজন কী ? কেবল মেনে নেওয়াই হলো সাধন। জপ অথবা ধ্যান— কোনো কিছুই করার কথা নেই। কেবল মেনে নেওয়া, এইটুকুই করণীয়। তিনি পরম সুহৃদ, তাঁর অপার দয়া—অকারণ প্রেম। ভগবানের দয়া অপার। তিনি অপার দয়াদৃষ্টিতে আমাদের দেখছেন, তাহলে আর কিসের চিন্তা ! মা যদি স্নেহের সঙ্গে শিশুকে ধরে তার ফোঁড়া চিরে দেন তাহলে চিন্তা কেন হবে ? মা তো দেখছেন। শিশু যদি কাঁদে তো সেটি হলো তার শিশুত্ব। যে বুঝদার সে তো কাঁদে না। আমাদের কাছে যদি কখনও দুঃখ আসে তাহলে বুঝতে হবে যে আমাদের মা, ভগবান আমাদের সুখী করবার জন্য, পবিত্র করবার জন্য কোলে করে ছেদন করছেন।

কত দয়াপূর্ণ দৃষ্টি। অপার দয়ার ছটা বিচ্ছুরিত হয়ে আছে। কোনো জায়গা তাঁর দয়া ও প্রেম থেকে খালি নয়। তাঁর দয়া ও প্রেম সর্বত্র পরিপূর্ণ রয়েছে। তিনি দর্শন দিতে প্রস্তুত। তিনি সকল প্রাণীর সুহৃদ। যদি সম্পূর্ণ বিশ্বাস থাকে যে ভগবান আমাদের দর্শন দেবেন তাহলে সেই মুহূর্তেই তাঁকে দর্শন দিতে হবে—তিনি এক মুহূর্তও থেমে থাকবেন না।

নাস্তিকদের তো বিশ্বাস নেই। তারা ভাবে যে ঈশ্বর আছেন, না নেই ! যারা মনে করে যে ঈশ্বর আছেন তারা ভাবে যে ঈশ্বরকে কি পাওয়া যাবে ! অন্যেরা ভাবে যে পাওয়া যাবে, তবে অনেক ভজন-ধ্যান করলে তবে পাওয়া যাবে। এটিও ভুল। ভগবান খুবই দয়ালু। যদি ভজন-ধ্যান করলে তবেই পাওয়া যায় তাহলে আর তিনি দয়ালু কীকরে হলেন। যদি আমাদের এই দৃঢ় বিশ্বাস হয়ে যায় যে তিনি খুবই দয়ালু, তাঁকে না পাওয়ার কারণ আমাদের বোকামী, আমরা তাঁকে পাব, অবশ্যই পাব এবং আজই পাব তাহলে তাঁকে আজকেই পেয়ে যাওয়ার কোনো শঙ্কা নেই।

ঈশ্বরের সকল বিধানেই কল্যাণ ভরা থাকে। কোথাও যদি অকল্যাণ দেখা যায় তাহলে তা হলো আমাদের বোঝার ঘাটতি। অণু-পরমাণুতে সব

সময় সমস্ত দেশ ও সকল বস্তুতে নিজেদের কল্যাণই দেখুন—এই দেখাই হলো সর্বত্র তাঁর দয়াকে দেখা। বিশ্বাসের সঙ্গে মেনে নিন তাহলে কাজ শেষ। তাঁর আনন্দের পরিসীমা নেই। শান্তি এবং আনন্দ প্রত্যক্ষ। এই কথাগুলি পড়তে ও শুনতেই মহান শান্তি ও আনন্দ হয়। তাহলে বারবার মনন করলে খুবই শান্তি এবং আনন্দের অনুভূতি কেন হবে না ?

ঈশ্বরের দয়া সর্বত্র। তাঁর প্রেমের ছটা সর্বত্র বিচ্ছুরিত। তাহলে আমরা কেন ভয় করব ? তিনি প্রেমের বিশাল সমুদ্র। আমরা তার মধ্যে নিমজ্জিত, প্রেম-জলে আমরা সিক্ত, মগ্ন হচ্ছি। এই ভাব যখন দৃঢ় হয়ে যাবে তখন আমরা শান্তির বাণ প্রত্যক্ষ করব। তখন প্রেম আনন্দের রূপে পরিণত হয়ে যাবে। এইটিই পরমাত্মার স্বরূপ। পরমাত্মা আনন্দময়। পরমাত্মা প্রেমময়। সেই প্রেমই প্রত্যক্ষ প্রকট হয়ে দর্শন দেয়। এখন সেই প্রেম অদৃশ্য। যখন প্রেম এসে যায় তখন ভগবান মূর্তিমান হয়ে প্রকট হন। ভগবান শ্রীরাম ও শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপই হলো প্রেমের পুঞ্জ। প্রেম ছাড়া অন্য কোনো জিনিস নেই। প্রেমই হলো আনন্দ। আর আনন্দ হলো প্রেম। একই জিনিস। ভগবান সগুণ-সাকারের উপাসকদের কাছে প্রেমময় হয়ে যান আর নির্গুণ-নিরাকারের উপাসকদের কাছে আনন্দময় হয়ে যান।

সংসারেও একই কথা। যার কাছে প্রেম যত বর্ধিত হবে তার কাছে আনন্দও ততটাই হবে। এই বিষয়েও এই কথা। সেই সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মাই ভক্তের কাছে প্রেমানন্দ আর সেই পূর্ণব্রহ্ম পরমাত্মা মূর্তিমান হয়ে প্রকট হন।

তুলসীদাস বলেছেন—

হরি ব্যাপক সর্বত্র সমানা।
প্রেম তেঁ প্রগট হোহিঁ মৈঁ জানা॥

হরি সব জায়গায় পরিপূর্ণ। তিনি প্রেমেতেই প্রকট হন, কেননা তিনি নিজেই প্রেমময়।

যদি বলেন যে কথা তো ঠিকই, কিন্তু আমাদের মধ্যে প্রেম নেই। তো

এটি হলো আপনাদের ধারণা। এমন কোনো জায়গা নেই যে সেখানে প্রেম নেই। প্রেমিকদের প্রেম এবং জ্ঞানীদের আনন্দ সব জায়গাতেই আছে। বেদান্তে অস্তি, ভাতি, প্রিয় বলা হয়েছে। বুঝতে হবে যে প্রিয় জিনিসটা কী ! প্রিয় এবং প্রেমের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। সংসারে এমন কোনো জিনিস নেই যাতে আনন্দ ব্যাপ্ত নেই, প্রেম তার স্বরূপ। তা সর্বত্র বিদ্যমান।

ভগবান বাল্মিকী মুনিকে থাকবার জায়গা জিজ্ঞাসা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন—'ভগবান, বলুন তো আপনি কোথায় নেই ?' সেই প্রেমময় পরমাত্মা ভিতর-বাহির সর্বত্র পরিপূর্ণ রয়েছেন।

আমাদের মধ্যে প্রেম নেই—ভজন-সাধনার কমতির জন্য আমরা ভগবানকে পাই না। এই না-পাওয়া আমাদের মনোভাবের দিক থেকে ঠিক। আমরা যদি তাঁকে স্বীকার করে নিয়ে ভজনা করি, সৎসঙ্গ করি তাহলে ভবিষ্যতে আমাদের কল্যাণ হতে পারে। এইটিই হলো নিয়ম, কিন্তু এতে দেরি হচ্ছে। একটি কথা এটির চেয়েও বেশি গুরুত্বপূর্ণ। আমরা আইন মেনে চলতে চাই। তাই ভগবান এই আইন প্রণয়ন করেছেন। কিন্তু এটি আমাদের মেনে নিতে হবে যে আইন তো আছেই। নিজেদের দৃষ্টিতে সে কথা ঠিক, কিন্তু ভগবান অসম্ভবকে সম্ভব করে দেন। তিনি তাঁর দাসেদের দোষের দিকে দেখেন না। তিনি বিনা কারণেই দাসেদের প্রতি দয়া ও প্রেম করেন। এই রকমই তাঁর স্বভাব। এই স্বভাবের প্রতি যদি আমাদের বিশ্বাস থাকে তাহলে আমরা ভাবব যে কেন এক মুহূর্তও দেরি হচ্ছে ! আমরা এই কথায় যেন অটল থাকি যে দেরি কেন হবে ? তারপরে আর দেরি হবে না।

আমাদের ভালবাসা, আমাদের কাজ দেরি করায়। কিন্তু নিজেদের ধারণাকে ছেড়ে দিয়ে যদি প্রভুকে মনে রাখি তাহলে আর দেরি হবে না। আমাদের ধারণা যেন শক্তিশালী হয়, 'প্রভু, আপনি তো পরম দয়ালু। আপনি তো দাসেদের দোষ দেখেন না। আপনার দয়া তো প্রত্যক্ষ। আপনি পরম প্রেমী—আপনার প্রেম তো বিনা কারণেই উৎসারিত হয়। হে প্রভু, আমি যখন মনে করতাম যে প্রভু ন্যায়পরায়ণ, যখন আমরা ভজনা করব

তখন তিনি দর্শন দেবেন, ততক্ষণ পর্যন্ত দেরি তো হবেই। কিন্তু প্রভু ! এখন তো আমি মনে করি যে আপনি পরম দয়ালু, আপনার একমাত্র স্বভাব হলো দয়া করা। আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে এখন এক মুহূর্তও দেরি হবে না।' এই রকম দৃঢ় বিশ্বাস যদি থাকে তাহলে ওই আইনের কারণে যে দেরি হচ্ছে, তাও হবে না।

এই কথাটি খুবই অসম্ভব মনে হয় যে মুহূর্তের মধ্যেই আমাদের কল্যাণ হয়ে যাবে। লোকেদের মনে এই ধারণা বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে যে ভগবান ন্যায় করেন—যখন আমরা যোগ্য হব তখন তিনি দর্শন দেবেন। এই কথা যুক্তিসম্মত হলেও ভগবানের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয় না। ভগবানের কাছে কিছুই অসম্ভব নয়। প্রভু এতো ক্ষমতাধর যে অসম্ভবও সম্ভব হতে পারে। প্রভুর প্রভাবও হলো এমনই। সেখানে সকল অসম্ভবই সম্ভব। এই কথাটি যদি আমরা বুঝে নিই তাহলে তখনই কল্যাণ হয়ে যাবে। দয়া, প্রেম হলো প্রভুর গুণ। অসম্ভবকে সম্ভব করে দেওয়াও হলো তাঁর প্রভাব। প্রভুর গুণগুলির প্রতি অথবা প্রভাবের প্রতি—কোনো একটির প্রতি বিশ্বাস হলেও আপনারা যেমনই হন না কেন আপনাদের একটি মিনিট দেরিও প্রভু সহ্য করতে পারেন না। আপনারা ব্যাকুল হয়ে প্রতীক্ষা করুন আর প্রভু তখনই প্রকট হয়ে যাবেন। কেবল তাঁর দয়ার উপরেই নির্ভর করতে হবে। তাহলেই আমাদের মতো লোকেদের তো কথাই নেই, আমাদের চেয়ে নিকৃষ্ট লোকেরাও মুহূর্তের মধ্যে দর্শন পেয়ে যেতে পারে। দর্শন পেতে আমাদের দেরির কারণ হলো আমরা বিশ্বাস করি না।

প্রশ্ন—এটি যথার্থ হবে কেমন করে ?

উত্তর—এই সব কথা বলা হচ্ছে ভগবান আর ভক্তের দয়াতে এটিকে যথার্থ করতে। যদি আমরা মেনে নিই যে ভগবানই এমন শ্রদ্ধা সৃষ্টি করেন আর তিনিই এমন শ্রদ্ধা উৎপন্ন করাবার পরিবেশ প্রস্তুত করেন তাহলে ভগবানের পক্ষে অকারণে এই সব সম্ভব—এতে সংশয় হবার কোনো কারণ থাকে না। প্রভু তো কৃপা করে চলেছেন। তুমি যে মনে কর যে প্রভু

কেন কৃপা করছেন না—সেইটিই হলো দেরি হওয়ার কারণ।

এই যে ভগবৎ বিষয়ের কথা—এগুলি রহস্যময়। মানুষ যদি প্রভুর গুণ এবং প্রভাবের রহস্য বুঝে নেয় তাহলে তাকে ধারণ করে নেবে। শুধু এটি ভাল করে বুঝে নিতে হবে। একবার বুঝে নিলে কাজ আর বাকি থাকে না। 'সংসারে যত বস্তু আছে তা বিষ।' যে এই কথা বুঝে নিয়েছে সে আর সেগুলিতে লিপ্ত থাকতে পারে না। যদি জানতে পারা যায় যে মিষ্টিতে বিষ মেশানো আছে তাহলে সেটি কেন খাবে ? যদি খায় তাহলে বুঝতে হবে যে সে বোঝেনি। কোনো দরিদ্র যদি পরশ পাথর পেয়ে যায় আর তার পরেও যদি সে দরিদ্রই থেকে যায় তাহলে বুঝতে হবে যে পরশ পাথর কী তা সে জানে না।

ভগবানের প্রেম আর দয়ার তত্ত্বকে বোঝা উচিত। তাঁর দয়া, প্রেম এবং প্রভাব অপার। তাঁর তত্ত্ব জানি না বলেই তা থেকে আমরা লাভান্বিত হতে পারি না। ভগবানের প্রভাব ভগবানের জন্য মোটেই নয়। তা তো আমাদের লাভের জন্য। এমন প্রভাবশালীর প্রভাব সংসারকে উদ্ধার করার জন্য। আন্তরিকভাবে যারা তাঁর এমন প্রভাবকে মেনে নেয় তারাই লাভবান হয়।

মনে করুন, জগতে একজন দয়াময় পুরুষ আছেন। তাঁর কাছে ধন আছে। তাঁর ধন থেকে সেই লাভ সংগ্রহ করে যে তাঁকে পয়সাওয়ালা ও দয়ালু বলে মানে, যে তাঁকে পয়সাওয়ালা বলে মেনে নিয়েও তাঁকে দয়ালু বলে না মানে সে লাভ পেতে পারে না। আর দয়ালু বলে মেনে নিয়েও যদি তাঁকে ধনী বলে না মানে তাহলেও লাভ থেকে সে বঞ্চিত থাকে। ঠিক কথা। এইভাবে মহাত্মাদের কাছ থেকে সে-ই লাভ সংগ্রহ করতে পারে যে তাঁদের মহাত্মা বলে জানে। অন্যেরাও পায়, কিন্তু সামান্য। যারা বোঝদার তারা পুরো এবং তাড়াতাড়ি লাভ পায়। দয়ালু ধনীকে যে দয়ালু বলে না মানে সেও লাভবান হয়, কিন্তু সামান্য। এভাবে ভগবানকে দয়ালু বলে না মানলেও লাভবান হতে পারে। অল্পমাত্র লাভ সকলেই পেতে পারে, কিন্তু যারা তাঁকে দয়ালু ও প্রভাবশালী বলে জানে তাদের বিশেষ লাভ হতে পারে।

সকলেই আগুনের তাপ পায় কিন্তু যে জানে এখানে আগুন রয়েছে সে তা থেকে বেশি লাভ পেতে পারে।

ঘরে পরশ পাথর আছে। সেটিকে লোহাতে ঠেকান হলো, লোহা সোনা হয়ে গেল। আমরা মনে করলাম যে এটি কাকতালীয় ঘটনা। আমাদের জানা নেই যে কেমন করে তা হলো। তবে কিছু লাভ হলো এবং আমরা যদি পরশ পাথরকে চিনতে পারি তাহলে পূর্ণ লাভ অর্জন করতে পারি।

সাধু-মহাত্মাদের দয়া, প্রেম, প্রভাব তেমনই অপার। ভগবানের অবতার হয়েছে। আমরা অনুশোচনা করি যে সেই সময় আমরাও তো কোনো না কোনো যোনিতে ছিলাম। আমরা লাভ সংগ্রহ করিনি। আবার যদি ভগবানের অবতার আসেন তাহলে আমরাও লাভ তুলে নেব। কিন্তু বোঝবার আছে, ভগবান তো ভক্তদের প্রেমে বাধ্য হয়ে অবতার হয়ে আসেন। ভগবানের প্রকট হওয়া ভক্তদের অধীন।

যদি এমন বিশ্বাস আমাদের হয়ে যায় তাহলে ভগবানের কাছ থেকে আমরা যা লাভ পেতে পারি তা ভক্তদের কাছ থেকেও নিয়ে নিতে পারি। ভগবান মানেন যে তাঁর ভক্ত তাঁর চেয়েও বড়, কেননা তিনি তো আইনে বাঁধা। তিনিই আইন প্রণয়নকারী, এইজন্য তিনি আইন ভাঙ্গতে পারেন না। কিন্তু ভক্তেরা এতো বলবান যে তাদের বশীভূত হয়ে তাঁকে (ভগবানকে) কখনও কখনও আইনকে অতিক্রম করতে হয়। এজন্য ভক্ত তাঁর চেয়ে বড়। কিন্তু ভক্তেরা সেকথা মনে করেন না। তাঁরা মনে করেন যে ভগবানই সর্বোত্তম। তাঁর চেয়ে বড় আর কেউ নেই। ভক্ত যেমন ভগবানকে সর্বোত্তম বলে মনে করেন তেমন ভগবানও ভক্তকে সর্বোত্তম বলে মনে করেন। ভগবান হলেন সৎসঙ্কল্প বিশিষ্ট। তিনি যা মনে করেন তা ঠিক। অতএব কেউ ছোট বা বড় নয়।

আমাদের এটি মনে করতে হবে যে এটি হলো তাঁদের প্রেমের লড়াই। আমাদের কাছে তাঁরা দুজনেই বড়। আমাদের দারিদ্র্য দূর করতে দুজনেই সমান। ভগবানের ভক্তদের সব সময় পাওয়া যায়। একথা ঠিক, কিন্তু কোটি

কোটি ভক্তদের মধ্যে মাত্র একজনই দুর্লভ মহাত্মা হয়ে থাকেন। ভগবান বলেছেন—

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্ যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাং বেত্তি তত্ত্বতঃ॥

(গীতা ৭।৩)

'হাজার হাজার মানুষের মধ্যে কোনও একজন আমাকে পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে আর সেই প্রযত্নশীল যোগীদের মধ্যেও একজনই আমাকে অবলম্বন করে তত্ত্বগতভাবে আমাকে পেয়ে থাকে।' কিন্তু ভক্ত তো রয়েছেন তাঁদের সর্বতোভাবে অভাবের কথা কেউ বলেন না। তাঁরা সর্বদাই আছেন। ভগবানের ভক্ত যদি না থাকেন তাহলে ভগবানের ভক্তির প্রচার কে করবে ! ভগবান নিজে তাঁর ভক্তির প্রচার করেন না। তাঁর সহায়ক থাকেন। নিজের ভক্তির কথা তো ভাল মানুষই প্রচার করেন না। আর ভগবান তো পুরুষোত্তম। যদি পৃথিবীতে ভক্ত না থাকতেন তাহলে ভগবানের ভক্তির নাম পৃথিবীতে থাকত না। তাই ভগবান ভক্তের কাছে ঋণী। হনুমানের ঋণ থেকে আজ পর্যন্ত ভগবান কিংবা ভরত কেউ মুক্ত হননি। কিন্তু হনুমান সেকথা মনে করেন না।

যে কাজ ভগবান করেন না ভক্ত সেই কাজ করে দেন। এই ন্যায্যতায় ভগবানের ভক্ত ভগবানের চেয়েও বড়।

——— ০ ———

প্রেম-সাধনা

ব্রজরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অনন্য প্রেমেই এই জীবনের সার্থকতা। যে ভাগ্যবান এই দিব্য, অনন্য এবং বিশুদ্ধ প্রেম-সুধা পান করে তার জীবন সার্থক হয়ে যায়। তার বহু যুগের জন্ম-জন্মান্তরের বিষয়-পিপাসা দূর হয়ে যায়, শান্ত হয়ে যায়। ভবতাপে সন্তপ্ত প্রাণী ভগবৎ-প্রেমের পাবন

মন্দাকিনীতে অবগাহন করে পূর্ণ শান্তি লাভ করে, এইটিই হলো সেই পরম রস। একে পান করে মানুষ সিদ্ধ, অমর এবং তৃপ্ত হয়ে যায়।[১] এই প্রেম লাভ করে মানুষ কোনো কিছুর জন্য আকাঙ্ক্ষা করে না, শোক বা দ্বেষ করে না, কোনো বস্তুতে আসক্ত হয় না এবং (বিষয়ভোগের জন্য) উৎসাহীও হয় না।[২]

প্রেমের সাধনা আছে এবং সাধনার ফলও (সাধ্য)[৩] আছে। পরমাত্মার মতো প্রেমের স্বরূপও অনির্বচনীয়। মূকের বচনের মতো এটিও বাণীর বিষয় নয়।[৪] এইজন্য প্রেমের স্বরূপকে অলৌকিক বলা হয়েছে। কেননা এটি লৌকিক বিষয় থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন। লৌকিক প্রেম ভোগ-কামনা এবং দুর্বাসনার দ্বারা দূষিত হওয়ার কারণে শুদ্ধ হয় না। যাতে বাসনার আধিক্য তা প্রেম নয়, তা হলো আসক্তিমূলক মোহ। তাছাড়া লৌকিক প্রেমের ব্যাপ্তি ক্ষণিক এবং বিনাশশীল। সেজন্য তা ভগবৎ-প্রেমের তুলনায় হেয়। ভগবৎ- প্রেমও যদি কোনো কামনা নিয়ে করা হয় তাহলে তাকে সকাম বলা হয়। সকাম প্রেমে দিব্যতা, অনন্যতা এবং শুদ্ধতা থাকে না। কামনা করা হয় লৌকিক বস্তুর জন্য। তাই ঐহিক আকাঙ্ক্ষার সংমিশ্রণ হয়ে যাওয়ার কারণে তার দিব্যতা নষ্ট হয়ে যায় এবং সেই আকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রেম বন্টিত হয়ে যায়। ফলে তাতে একনিষ্ঠতা ও অনন্যতা থাকে না। এইভাবে কামনার সঙ্গে মিশ্রিত হয়ে যাওয়ার ফলে সেই প্রেম বিশুদ্ধ থাকে না। দিব্য, অনন্য এবং বিশুদ্ধ প্রেম তো তিনটি গুণের অতীত এবং কামনাযুক্ত। প্রতিক্ষণ তার বৃদ্ধি হয়। কখনও হ্রাস পায় না। তা অতি সূক্ষ্ম। তাকে কথায় ব্যক্ত করা

---

[১]যল্লব্ধ্বা পুমান্ সিদ্ধো ভবতি, অমৃতো ভবতি, তৃপ্তো ভবতি।

(নারদভক্তিসূত্র ৪)

[২]যৎ প্রাপ্য ন কিঞ্চিদ্ বাঞ্ছতি ন শোচতি ন দ্বেষ্টি ন রমতে নোৎসাহী ভবতি॥

(নারদভক্তিসূত্র ৫)

[৩]সাধন সিদ্ধি রাম পগ নেহু। (শ্রীরামচরিতমানস ২।২৮৯।৮)

[৪]অনির্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্, মূকাস্বাদনবৎ। (নারদভক্তিসূত্র ৫১, ৫২)

যায় না। তা হলো অনুভবের বিষয়[১]।

হেতু অথবা কামনাই প্রেমের দূষণ। অহৈতুক অথবা নিষ্কাম প্রেমে কামনার সামান্যতম গন্ধও নেই। সেজন্য তা শুদ্ধ। নিজের অভিন্ন প্রিয়তম পরমাত্মা শ্রীকৃষ্ণ ব্যতীত অন্য কেউ এই প্রেমের লক্ষ্য নয়। এইজন্য তা অনন্য এবং উপরে কথিত অনুসারে ঐহিক বস্তু থেকে সম্পর্ক ভিন্ন হওয়ায় এই প্রেম দিব্য।

এই প্রেম লাভ করে প্রেমিক সর্বদা আনন্দে বিভোর হয়ে থাকে। সংসারের চিন্তা তাকে স্পর্শ করতে পারে না। তার দৃষ্টিতে প্রেম ব্যতীত আর কিছু থাকতেই পারে না। সে প্রেমকেই দেখে, প্রেমকেই শোনে এবং প্রেমেরই বর্ণনা ও চিন্তন করে। তার মন, প্রাণ এবং আত্মা প্রেমেরই গঙ্গায় অনবরত অবগাহন করতে থাকে। সে তার সকল ধর্ম এবং আচরণ প্রেমময় শ্রীকৃষ্ণকেই অর্পণ করে দেয়। মুহূর্তের জন্যও বিস্মৃত হলে সে খুবই ব্যাকুল, খুবই অশান্ত হয়ে যায়।[২] সে সর্বত্র প্রেমময় ভগবানকেই, সব কিছু ভগবানের মধ্যে দেখে। এই রকম দৃষ্টিসম্পন্ন মানুষের চোখে ভগবান দূরে থাকতে পারেন না আর তিনিও ভগবান থেকে দূরে থাকতে পারেন না।

এইভাবে উভয়ের ঐক্য, শাশ্বত সংযোগ অবস্থান করে। ভগবান এই রকম ভক্তের লোকোত্তর অনুরাগ দেখে নিজের মহেশ্বর ভাব ভুলে গিয়ে তাঁর প্রাণপ্রিয় ভক্তকে দেখতে থাকেন, তার কাছে তাঁরই মতো হয়ে গিয়ে ভক্তের ইচ্ছামতো মূর্তি ধারণ করে খেলতে, নাচতে, গাইতে, বাজাতে এবং আনন্দ করতে থাকেন।

প্রেমী ভক্ত মিলন ও বিরহের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে যান। তিনি তো শুধু প্রেমই প্রদান করতে থাকেন, তাও শুধুমাত্র প্রেমের জন্য। সেই প্রেমতত্ত্বজ্ঞ

---

[১]গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্ধমানমবিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্।
(নারদভক্তিসূত্র ৫৪)

[২]নারদস্তু তদর্পিতাখিলাচারতা তদ্বিস্মরণে পরমব্যাকুলতেতি।
(নারদভক্তিসূত্র ১৯)

প্রিয়তম নিজেও মিলিত না হয়ে থাকতে পারেন না। তাঁর যদি গরজ হয় তো তিনি নিজেই আসবেন। ভক্ত মিলিত হবার জন্য কেন হয়রান হবে ? আর বিচ্ছেদকে তিনি কেন ভয় পাবেন ? তাঁর তো নিজের জন্য সুখ বা আনন্দের কোনো আকাঙ্ক্ষা নেই। তিনি তো সেই প্রিয়তমের সুখের জন্যই সব কিছু করেন। তাঁর যদি মিলনে সুখ হয় তাহলে নিজে থেকেই মিলতে আসবেন। বিচ্ছেদে যদি দুঃখ হয়, তাহলে কখনই এখান থেকে চলে যাবেন না, তিনি তো প্রেমের লোভী, প্রেম থাকলে তিনি নিজে থেকেই দৌড়ে আসবেন। আর তা না থাকলে ডাকলেও আসবেন না। এইজন্য যিনি নিষ্কাম প্রেমী তিনি ভগবানকেও ডাকেন না। আসলে ভগবানকে দর্শন দেবার জন্য ডাকবার কিংবা আটকাবার কোনো প্রয়োজনই নেই। বিনা কোনো কামনায় বা কারণে ভগবানের প্রতি প্রেম বৃদ্ধি করা আবশ্যক। অহংকার থেকে দূরে থেকে মিলন-বিরহের চিন্তা থেকে মুক্ত হয়ে উত্তরোত্তর প্রেম বৃদ্ধি পেতে থাকুক—এরই জন্য সকল প্রয়াস হওয়া উচিত। প্রহ্লাদ কখনই 'আমাকে দর্শন দাও' বলে প্রার্থনা করেননি। সব কিছু ভগবান নিজে থেকেই করেছেন।

ভগবৎ প্রেমীর পূজা, খাওয়া-পরা, কাঁদা-হাসা সব কিছুই ভগবানকে প্রীত করার জন্য হতে হবে। প্রেমীর কাছে প্রেমময় ভগবান ছাড়া আর কোনো লক্ষ্য যেন না থাকে। দর্শন-মিলন এইসব তো আনুষঙ্গিক ফল, নিজে থেকেই তা পাওয়া যায়। এই প্রেমের পূর্ণতা সেই দিব্য, অনন্য এবং বিশুদ্ধ প্রেমেতেই আছে—সেখানে প্রেম, প্রেমিক এবং প্রিয়তমের একাত্মতা হয়।

এইরকম যে প্রেমী, তিনি দিব্য প্রেমের সাক্ষাৎ স্বরূপ। তাঁর বাণী প্রেমে ওতপ্রোত থাকে আর শরীর এবং মন প্রেমরসে সিক্ত থাকে। তাঁর প্রতিটি লোমকূপ প্রেমানন্দে নৃত্য করতে থাকে। তাঁর সঙ্গে কথা বললে, তাঁর সম্পর্কে চিন্তা করলে এবং তাঁর কাছে গেলে নিজের মধ্যে প্রেম জাগ্রত হয়। তাঁকে স্পর্শ করলে নিরস হৃদয়েও প্রেমের সঞ্চার হয়। বড় বড় নাস্তিকও

তাঁর সম্পর্কে এলে সব কিছু ভুলে প্রেম-পাগল হয়ে যায়। তাঁর অনন্য অনুরাগ এবং অলৌকিক ভাবোদ্রেককে ঠিক ঠিক হৃদয়ঙ্গম করাবার উপযুক্ত ভাষা নেই। বোঝাবার জন্য তাঁর ভাবকে যে কোনো ভাবেই বলা হোক না কেন বাস্তবে সেই সবই তাঁর ভাবের ধরা-ছোঁয়ার বাইরে।

এই দিব্য প্রেমের তুলনা সখ্যভাবের সঙ্গেও করা যায় না। এই ভাব সখ্যতার চেয়েও বড়। অর্জুনকে সখ্যভাবের দৃষ্টান্ত বলে মনে করা হয়। কিন্তু অর্জুনের মধ্যে এই দিব্য অলৌকিক ভাবে ন্যূনতা দেখা যায়। তিনিও ভগবানের বিরাট রূপ দেখে ভয়ভীত হয়েছিলেন। ভগবানের সঙ্গে তাঁর সখ্যতাকে, সমান আচরণ করাকে বড় অপরাধ বলে মনে করেছিলেন। সেজন্য তাঁকে বার বার ক্ষমা চাইতে দেখা গিয়েছিল—

'তৎক্ষাময়ে ত্বামহমপ্রমেয়ম্॥' (গীতা ১১।৪২)

'পিতেব পুত্রস্য সখেব সখ্যুঃ
প্রিয়ঃ প্রিয়ায়ার্হসি দেব সোঢুম্॥'

(গীতা ১১।৪৪)

এবং ভগবানও তাঁকে **'মা তে ব্যথা মা চ বিমূঢ়ভাবঃ'** (গীতা ১১।৪৯) প্রভৃতি বলে আশ্বাস দিয়েছেন।

দাস্যভাবের থেকেও সেই অনন্য প্রেমীর ভাব অত্যন্ত উৎকৃষ্ট। দাস্যভাবে উঁচু-নিচু, প্রভু-সেবকের দৃষ্টি আছে। কিন্তু এখানে পূর্ণ সাম্য আছে, কেউ প্রভু বা কেউ সেবক নয়। ভক্ত ভগবানের প্রেম-গঙ্গায় নিমজ্জিত হয়ে প্রসন্ন হন এবং ভগবানও তেমনই প্রেমে মগ্ন হয়ে যান।

এই দিব্য অনন্য ভাবের স্থান বাৎসল্য ভাব থেকেও উপরে। সেখানে সেই লোকোত্তর সাম্যের দর্শন হয় না, যা এখানে সহজেই অনুভূত হয়। সেখানে ছোট-বড়, পিতা-পুত্র প্রভৃতি ভাব থাকে। কিন্তু এখানে কেউ ছোট নয়, বড়ও নয়, কেউ মা-বাবা নেই, কেউ কারও পুত্রও নয়। সবাই সমান।

মাধুর্য ভাব থেকেও এই অদ্ভুত প্রেমভাব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মাধুর্যভাবেরও দুটি স্বরূপ—স্বকীয়ভাব এবং পরকীয় ভাব। পরমশ্রেষ্ঠ সতী শিরোমণি পতিব্রতা

নারীর তার প্রিয়তম পতির প্রতি যে গুপ্ত প্রেম থাকে, সেই ভাব থেকে ভগবানের দিব্য স্বরূপে যে উচ্চ শ্রেণীর প্রেম, তাকে পরকীয়াভাব বলে। উপরে উল্লিখিত প্রেমী এই সমস্ত ভাব থেকে উপরে অবস্থিত। ভগবানের সঙ্গে তার এক মুহূর্তের জন্যও বিচ্ছেদ হয় না। ভগবান তার অধীন, তার কাছে বিক্রীত। ভগবান তার সঙ্গ ছেড়ে কোথাও যান না, সেই অনন্যপ্রেমী ভক্ত পূর্ণ প্রেমময় থাকেন। তিনি ভগবান থেকে আলাদা নন, ভগবানও তাঁর থেকে আলাদা নন। এই অবস্থায় ভয়, সঙ্কোচ নেই ; মান, সম্মান এবং সংকারের কোনো খেয়ালও এখানে থাকে না। বড়ো ছোটর কোনো পার্থক্য এখানে করা হয় না। (ভক্ত এবং ভগবানের মধ্যে) কেউ উত্তম বা মধ্যম নেই। উভয়েই সমান।

পতিব্রতা নারী তার পতিকে নারায়ণ মনে করে এবং নিজেকে মনে করে তার দাসী। এই ভাব খুবই ভাল এবং কল্যাণকর। তাহলেও এর মধ্যে ছোট-বড়োর শ্রেণীভেদ আছে। কিন্তু উপরোক্ত দিব্যপ্রেমে ছোট-বড়োর কোনো ভেদ নেই। সেখানে উভয়ের একই স্থিতি—সমান অবস্থা।

পরকীয়াভাবে অন্যের ভয় থাকে, গোপনতা থাকে। কিন্তু এখানে এই দিব্য প্রেমে ভয়, গোপনতা নেই, সঙ্কোচের তো কথাই নেই। ভগবানের গুণ এবং প্রভাবে প্রভাবিত হয়েই পরকীয়ার মন তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়। যেখানে নিজের থেকে খুবই শ্রেষ্ঠ বলে মানা হয় সেখানে নিজের ন্যূনতাবোধ তো থাকেই। তাই সেখানেও নির্ভীকতা এবং পূর্ণ সাম্য থাকে না। কিন্তু অনন্য এবং বিশুদ্ধ প্রেমে গুণ এবং প্রভাবের বিস্মৃতি আছে। স্মৃতি থাকলেও তার কোনো মূল্য নেই। এখানে তো দুজনের মধ্যে অনির্বচনীয় একতা থাকে, এখানে সর্বশক্তিমান এবং সর্বান্তর্যামী বলে স্তব করা হয় না। স্তুতির অবস্থা তো অনেক আগেই শেষ হয়ে যায়। এখন কে সর্বশক্তিমান এবং কেই বা সর্বেশ্বর! দুজনেই এক, দুজনেই সমান। দুজনেই দুজনের প্রেমিক এবং প্রিয়তম। এঁদের মধ্যে পরস্পর অকারণ সহজ প্রেম আছে। এই অবস্থায় প্রেম, প্রেমিক এবং প্রেমাস্পদের মধ্যে কোনো

ভেদ থাকে না। ভক্তি, ভক্ত এবং ভক্তিমান—সব এক হয়ে যান। একজন ভাবুক্ত ভক্তের নিম্নলিখিত কথায় এই ভাবটির পুষ্টি হয়েছে—

ত্রিধাপ্যেকং সদাগম্যং গম্যমেকপ্রভেদনে।
প্রেম প্রেমী প্রেমপাত্রং ত্রিতয়ং প্রণতোঽস্ম্যহম্॥

'প্রেম, প্রেমী এবং প্রেমপাত্র (প্রিয়তম)—এগুলি দেখতে ভিন্ন হলেও বাস্তবে এক। এদের তত্ত্ব সবসময় সকলের বোধগম্য হয় না। এদের এক বলেই জানতে হবে। আমি এই তিনটিকে, যা বস্তুত এক, প্রণাম করছি।'

এইরকম অনন্য প্রেমীর দৃষ্টিতে সর্বত্র এবং সব সময় দিব্য প্রেমের অখণ্ড জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে থাকে। তিনি সমগ্র জগতে সমানভাবে প্রেমামৃত বর্ষণ করতে থাকেন। তাঁর দৃষ্টিতে কেউ ঘৃণা বা বিদ্বেষের পাত্র নয়। তাঁর জন্য সর্বত্র প্রেমের মহাসাগর তরঙ্গায়িত থাকে।

জ্ঞানমার্গে সাধনরত মহাত্মা অদ্বৈত, অভেদরূপে ব্রহ্মকে লাভ করেন—**'ব্রহ্মৈব সন্ ব্রহ্মাপ্যেতি।'** 'ব্রহ্ম হয়েই তিনি ব্রহ্মকে পান।' কিন্তু এখানে এই দিব্য প্রেম-সংসারের অনুভূতি অনন্যা হয়ে থাকে। এখানে দ্বৈত নেই, অদ্বৈতও নেই। উভয়ের স্থিতি বিলক্ষণ। প্রেমিক ও প্রিয়তমের নিত্যনতুন প্রেম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পায়। **'প্রতিক্ষণবর্ধমানম্'** (নারদভক্তিসূত্র ৫৪)—এটি প্রতিফলিত হতে থাকে। বৃদ্ধি পেতে পেতে এ অসীম, অনন্ত হয়ে যায়। ভক্ত এবং ভগবান একে অপরের মধ্যে এমন একাকার হয়ে যান যে তাঁদের মধ্যে দ্বৈত ভাব থাকে না। এঁদের দিব্য ভাবকে কথায় প্রকাশ করা অসম্ভব। এখানে প্রেম ছাড়া আর কিছু থাকে না। এই প্রেমিকদের মিলনও খুব বৈশিষ্ট্যপূর্ণ— খুবই অলৌকিক। এখানে অদ্বৈত হয়েও দ্বৈত এবং দ্বৈত হয়েও অদ্বৈত। আমাদের দুটি হাত পরস্পর সংলগ্ন হয়ে এক হয়ে যায়, তেমনই এরা দুটি হয়েও এক এবং এক হয়েও দুই। এইভাবে এখানে ভেদও নেই, অভেদও নেই।

গঙ্গা এবং সাগর মিলিত হয়ে এক হয়ে যায়। কিন্তু ভগবান এবং অনন্য প্রেমীর দিব্য মিলন তা থেকেও বিলক্ষণ। সেটি অলৌকিক এবং অনির্বচনীয় অবস্থা। ভেদ-অভেদের ঊর্ধ্বের অবস্থা। এই মিলন নিত্য।

এখানে বস্ত্র, অলঙ্কার এবং শস্ত্রের (আয়ুধের) ব্যবধান বাঞ্ছনীয় নয়। বস্ত্রের ব্যবধান লজ্জা নিবারণের জন্য প্রত্যাশিত। লজ্জা হয় অন্যের কাছে। এখানে তো প্রেমিক ও প্রিয়তম এক হয়ে গিয়েছেন। নিজের কাছে কেউ কি লজ্জা করে ? বন্ধ ঘরে যদি আর কেউ না থাকে তাহলে লজ্জা নিবারণের জন্য বস্ত্রের প্রয়োজন হয় না। এই দিব্য মিলনে দ্বৈত ভাব দূর হয়ে গিয়েছে। অপরের চোখে ভেদ প্রতীত হয়। এই মিলনে তো অলঙ্কারও দূষণ বলে মনে হয়। এখানে পরস্পরের মধ্যে মান-সম্মান, আদর আপ্যায়নের কোনো প্রয়োগ নেই। যেখানে পূর্ণরূপে প্রেম আছে সেখানে আদর-আপ্যায়ন তো এক বিঘ্ন। কেউ কি নিজেই নিজেকে সম্মান দেখায় ? এটি হলো গোপীদের প্রেমের ফল।

এই স্থিতিতে শোক, মোহ, ভয় প্রভৃতির নাম-গন্ধ থাকে না—এখানে কেবল দেখতে ভিন্ন মনে হলেও বাস্তবে সম্পূর্ণ একত্ব বিদ্যমান। অনন্য প্রেমিকদের বাইরের আচরণ যেমনই হোক অন্তরে তারা একনিষ্ঠ, ভগবৎময়। এইজন্য তাদের নিত্য ভগবানে অবস্থান। গীতায় ভগবান বলেছেন—

সর্বভূতস্থিতং যো মাং ভজত্যেকত্বমাস্থিতঃ।
সর্বথা বর্তমানোঽপি স যোগী ময়ি বর্ততে॥

(৬।৩১)

'যে পুরুষ একইভাবে স্থিত থেকে সকল পদার্থে আত্মরূপে স্থিত আমাকে সচ্চিদানন্দময় বাসুদেবরূপে ভজনা করে সেই যোগী সর্বপ্রকারে অবস্থান করলেও আমাতেই স্থিত থাকে। কেননা তার অনুভূতিতে আমি ছাড়া আর কিছুই নেই।'

এটি দ্বৈত-অদ্বৈত, ভেদ-অভেদ থেকে ভিন্ন এক অনির্বচনীয় অবস্থা। ব্রজরাজ ভগবান শ্রীকৃষ্ণের এই অনন্য প্রেম লাভ করাই সকল মানুষের প্রকৃত লক্ষ্য হওয়া উচিত। কেননা এতেই জীবন ও জন্মের সার্থকতা।

——— ০ ———

নামের অনন্ত মহিমা

শ্রীভগবানের নামের মহিমা অনন্ত এবং খুবই রহস্যময়। শেষ, মহেশ এবং গণেশের তো কথাই নেই—ভগবান নিজেও তাঁর নামের মহিমা বর্ণনা করতে সক্ষম নন—**'রাম ন সকহিঁ নাম গুন গাঈ'** তাহলে আমার মতো ক্ষুদ্র মানুষ নাম-মাহাত্ম্য সম্পর্কে কী আর বলবে ? তবু মহাপুরুষেরা কোনো কিছুকে নিমিত্ত করে ভগবানের গুণগানের দ্বারা সময় অতিবাহিত করার প্রশংসা করেছেন। এই কারণে নামের মহিমা সম্পর্কে সামান্য কিছু লেখার চেষ্টা করা হচ্ছে।

ভগবানের নামের মহিমা সকল যুগে সব সময় সমস্ত সাধনের চেয়ে বেশি মহত্ত্বপূর্ণ, কিন্তু কলিযুগে তা সকলের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

ধ্যায়ন্ কৃতে যজন্ যজ্ঞৈস্ত্রেতায়াং দ্বাপরেঽর্চয়ন্।
যদাপ্নোতি তদাপ্নোতি কলৌ সঙ্কীর্ত্য কেশবম্॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।২।১৭)

'সত্যযুগে ধ্যান করলে, ত্রেতাতে যজ্ঞ করলে, দ্বাপরে পূজা করলে যে ফল পাওয়া যায় সেই ফলই কলিযুগে কেবল শ্রীকেশবের কীর্তনের দ্বারা মানুষ পেয়ে যায়।'

নারদপুরাণে তো একথাও বলা হয়েছে—

হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥

(১।৪১।১১৫)

'কলিযুগে কেবল শ্রীহরির নামই-হরির নামই-হরির নামই পরম কল্যাণকারী, এটি ছেড়ে অন্য কোনো উপায় নেই।'

এর অভিপ্রায় হলো এই যে কর্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি সাধনগুলি যথাযথভাবে পালন করা এই যুগে অত্যন্ত কঠিন। তাছাড়া ভগবানের নাম খুবই সুগম সাধন, সকলেই এর অধিকারী, সকলেই এটি বুঝতে পারেন,

সকলের কাছে এটি সুলভ, অতি মূর্খও নামের জপ-কীর্তন করতে পারে। এতে কোনো খরচ নেই, পরিশ্রমও নেই। অদ্যাবধি কোনো বাধাও এতে আসেনি, এত সুবিধা থাকা সত্ত্বেও সবচেয়ে বড় কথা হলো এতো কোনো শর্ত আরোপিত নেই—

সাঙ্কেত্যং পারিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥
পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সন্দষ্টস্তপ্ত আহতঃ।
হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাম্॥

(শ্রীমদ্ভাগবত ৬।২।১৪-১৫)

মহাপুরুষেরা এই কথা জানেন যে 'পুত্রাদির সঙ্কেতেই হোক, হাসিতে হোক, স্তোভে হোক (সঙ্গীতের আলাপ পূর্ণ করাবর জন্য) কিংবা অবহেলা অথবা অবজ্ঞায় হোক, বৈকুণ্ঠ ভগবানের নামোচ্চারণ সকল পাপের নাশ করে। যে মানুষ উঁচু জায়গা থেকে পড়বার সময়, পা পিছলে গেলে, অঙ্গহানি হলে, সর্পাদি কামড়ালে, জ্বরে দেহতপ্ত হলে অথবা যুদ্ধে আঘাত প্রাপ্ত অবস্থায় বিবশ হয়েও 'হরি' (কেবল এই কথাটুকু) যদি উচ্চারণ করে তাহলে তাকে নরকাদি কোনো যন্ত্রণাই ভোগ করতে হয় না।'

অবশেনাপি যন্নাম্নি কীর্তিতে সর্বপাতকৈঃ।
পুমান্ বিমুচ্যতে সদ্যঃ সিংহত্রস্তৈর্মৃগৈরিব॥

(বিষ্ণুপুরাণ ৬।৮।১৯)

'বিবশ হয়েও হরির নাম কীর্তন করলে মানুষ সকল পাপ থেকে যেমন মুক্ত হয়ে যায় অর্থাৎ তার সকল পাপ তেমনভাবেই চলে যায় যেমন সিংহের ভয়ে হরিণ পলায়ন করে।'

তুলসীদাস শ্রীরামচরিতমানস-এ বলেছেন—

ভায়ঁ কুভায়ঁ অনখ আলসহূঁ। নাম জপত মঙ্গল দিসি দসহূঁ॥

প্রশ্ন—যদি কথা তাই হয় যে, যে কোনো ভাবে নাম নিলেই পাপ দূর হয়ে ভগবৎপ্রাপ্তি হয়ে যায় তাহলে শ্রদ্ধা, প্রেম এবং নিষ্কামভাব প্রভৃতির

শর্ত কেন ?

উত্তর—শ্রদ্ধা প্রভৃতির শর্ত তাড়াতাড়ি পাওয়ার জন্য। যারা নাম নেয় তারা সবাই তো পাবেই, কিন্তু যিনি শ্রদ্ধা, প্রেম এবং নিষ্কামভাবে নাম জপ করবেন তিনি তো শীঘ্রই পেয়ে যাবেন।

মনু বলেছেন—

বিধিযজ্ঞাজ্জপযজ্ঞো বিশিষ্টো দশভির্গুণৈঃ।
উপাংশুঃ স্যাচ্ছতগুণঃ সাহস্রো মানসঃ স্মৃতঃ ॥ (২।৮৫)

'দর্শপৌর্ণমাসাদি বিধিযজ্ঞগুলি থেকে সাধারণ (যা জোরে জোরে করা হয়) জপযজ্ঞ দশগুণ ভাল। উপাংশু শত গুণ ভাল এবং মানস জপ হাজার গুণ ভাল।' আর যে জপ কেবল ভগবৎ প্রাপ্তির উদ্দেশ্যে প্রেম এবং শ্রদ্ধার সঙ্গে করা হয় তার ফল অনন্তগুণ ভাল। তার কোনো সীমাই নেই। এমন কি যদি মানুষ ভগবানের অনন্ত প্রেমে বিহ্বল হয়ে একবারও ভগবানের নামোচ্চারণ করে তাহলে ভগবান সেখানে উপস্থিত হয়ে তাকে দেখা দেন।

প্রশ্ন—নিজেদের বুদ্ধিমতো তো লোকেরা ভগবানের নাম জপ করে। তবু ভগবানের দর্শন পাওয়া যায় না। এর কী কারণ ? যদি প্রেমের অল্পতাকে এর কারণ বলে মনে করা হয় তাহলে সেই অল্পতাকে দূর করা যাবে কী-করে ?

উত্তর—প্রেম-ভাব নিয়ে জপ করতে করতেই সেই প্রেমকে পাওয়া যায় যাতে বিহ্বল হয়ে একবার নামোচ্চারণ করলেই ভগবান দর্শন দিতে পারেন।

প্রশ্ন—এই রকম সকাম প্রেমে ভগবান প্রকট হতে পারেন, নাকি নিষ্কামে ?

উত্তর—প্রেমের বাহুল্য হলে সকামেও ভগবান প্রকট হতে পারেন। কিন্তু সেই সকাম প্রেমও দ্রৌপদী অথবা গজেন্দ্রের মতো অনন্য হতে হবে। আর সকামে যখন ভগবান প্রকট হতে পারেন তখন নিষ্কামের কথা আর কী বলার আছে ?

প্রশ্ন—নামের সম্বন্ধে এমন শ্লোক পাওয়া যায়—

নাম্নোঽস্তি যাবতী শক্তিঃ পাপনির্হরণে হরেঃ।
শ্বপচোঽপি নরঃ কর্তুং ক্ষমস্তাবন্ন কিল্বিষম্॥

(অনুস্মৃতি ৯৯)

'শ্রীহরির নামে পাপ নাশ করবার যত শক্তি আছে চণ্ডালও তত পাপ করতে সমর্থ নয়।'

আর এতে মানস-নাম জপের অথবা প্রেমপূর্বক জপেরও কোনো শর্ত নেই। তাহলে পাপের নাশ কেন দেখা যায় না ?

উত্তর—নাম মাহাত্ম্যে বিশ্বাস নেই এবং নামাপরাধযুক্ত নাম-জপ করা হয়। নামের দশটি অপরাধ আছে। সেই অপরাধযুক্ত জপ হলে তার অনেক অংশ অপরাধ দূর করতে খরচ হয়ে যায়। তথাপি যদি মানুষ বিশ্বাসের সঙ্গে নাম-জপ করতে থাকে তাহলে নাম করতে করতেই নামাপরাধও নাশ হতে পারে। আর সমস্ত পাপ নষ্ট হয়ে গিয়ে ভগবৎপ্রাপ্তিও হতে পারে।

প্রশ্ন—মানুষ মরার সময় ভগবানের নাম যদি উচ্চারণ করে, কিন্তু ভগবানের স্বরূপের ধ্যান না করে—এই অবস্থায় সে পরজন্মে নাম লাভ করবে—স্বরূপের প্রাপ্তি তো হবে না। তাহলে অনন্ত কাল ধরে নামোচ্চারণের দ্বারা মুক্তি হবে একথা কেমন করে মানা যাবে ?

উত্তর—ভগবান হলেন নামের অধীন। নামেতে এমন শক্তি আছে যা নামি অর্থাৎ ভগবানের সাক্ষাৎ দর্শন করিয়ে দেয়। এজন্য মুক্তি লাভে কোনো বাধা নেই। শ্রীচৈতন্য মহাপ্রভু বলেছেন—

নাম্নামকারি বহুধা নিজসর্বশক্তি-
স্তত্রার্পিতা নিয়মিতঃ স্মরণে ন কালঃ।
এতাদৃশী তব কৃপা ভগবন্মমাপি
দুর্দৈবমীদৃশমিহাজনি নানুরাগঃ॥

'হে ভগবান ! আপনি নিজের অনেক নাম প্রকাশ করেছেন এবং সেগুলিতে নিজের সকল শক্তি অর্পণ করে দিয়েছেন। নাম স্মরণে সময়েরও কোনো নিয়ম রাখেননি। আপনার তো এই রকমই অসীম কৃপা

আর আমার এমন দুর্ভাগ্য যে আমার নামের প্রতি কোনো অনুরাগই হয়নি।'

প্রশ্ন—শাস্ত্র বলে যে '**ঋতে জ্ঞানান্ন মুক্তিঃ**' জ্ঞান ছাড়া মুক্তি হয় না। তাহলে নাম জপ করলে মুক্তি হওয়ার কথা কীকরে মানা যাবে ?

উত্তর—নামি অর্থাৎ ভগবানকে যথার্থ তত্ত্বগতভাবে জেনে নেওয়া অর্থাৎ ভগবান যেমন সেইভাবেই তাঁকে জানাই হলো জ্ঞান। আর নামীকে যথার্থভাবে জানিয়ে দেওয়ার মধ্যে শক্তি নামের মধ্যে আছে। তাহলে মুক্তি হওয়ায় সন্দেহ কোথায় ?

প্রশ্ন—স্নানাদি সম্পন্ন করে পবিত্র হয়ে বিধিপূর্বক নাম জপ করতে হবে, নাকি বিধি-অবিধির কোনো পরোয়া না করেই তা করা যাবে ? তাছাড়া এইভাবে নাম-জপ নির্দিষ্ট সংখ্যায় করা হবে, নাকি যতটা ইচ্ছা ততটাই করা হবে ?

উত্তর—ভগবানের নামের এতই মহিমা যে তা যে কেউ যেমন ভাবেই করুক না কেন, তা ফলপ্রসু হবেই। ক্ষেতে বীজ যেমনভাবেই পোঁতা হোক না কেন তার উদ্গাম হবেই। তবু বিধিপূর্বক জপ করার বিশেষ গুরুত্ব আছে। সংখ্যার সম্বন্ধেও এই কথা বুঝতে হবে। বিধিপূর্বক এবং নির্দিষ্ট সংখ্যক জপ করলে জপের প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় এবং শ্রদ্ধা সহকারে করা সাধন বিশেষ ফলদায়ক হয়। বিধি এবং সংখ্যার নিয়ম থাকলে ঠিক সময়ে ততটা জপেই হয়ে থাকে। যারা বিধি এবং সংখ্যার বন্ধন মানে না তারা ভুলবশত জপ ছেড়ে দেয়। অবশ্য স্বভাবতই অষ্টপ্রহর (সর্বক্ষণ) নাম জপ যিনি করেন তাঁর জন্য কোনো নিয়ম নেই।

মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—

তস্য বাচকঃ প্রণবঃ। (১।২৭)

তজ্জপস্তদর্থভাবনম্। (১।২৮)

ততঃ প্রত্যক্‌চেতনাধিগমোঽপ্যন্তরায়াভাবশ্চ। (১।২৯)

'সেই পরমাত্মার বাচক (নাম) হলো ওঁকার। তাঁর নাম জপ এবং তার অর্থের ভাবনা অর্থাৎ স্বরূপের চিন্তন করো। এরূপ করলে সকল বিঘ্নের নাশ

এবং পরমাত্মার প্রাপ্তিও হয়।'

প্রশ্ন—কিন্তু যখন কেবল নাম-জপেতেই ভগবৎ প্রাপ্তি হতে পারে তখন অর্থসহ জপ করার প্রয়োজন কী ?

উত্তর—অর্থসহ জপ করলে লাভ তাড়াতাড়ি হয়। যথা, কোন চৌবাচ্চায় দুটি পাইপ থেকে জল আসতে পারে কিন্তু তাদের একটা খোলা, একটা বন্ধ। একটা পাইপ দিয়ে আসা জলে চৌবাচ্চা দু ঘন্টায় ভরে যায়। কিন্তু যদি অন্য পাইপটাও খুলে দেওয়া হয় তাহলে দু ঘন্টার বদলে এক ঘন্টাতেই ভরে যেতে পারে। এইভাবে অর্থসহ জপ করলে লাভ শীঘ্রই হয়।

প্রশ্ন— বেদ, উপনিষদ্ এবং গীতায় প্রণব (ওঁ) এর অনেক মাহাত্ম্য বলা হয়েছে, ভগবানের অন্য নামেরও কি এইরকম মাহাত্ম্য ?

উত্তর—ভগবানের সকল নামই পরম কল্যাণকারক। রাম, কৃষ্ণ, হরি, নারায়ণ, দামোদর, শিব, শঙ্কর প্রভৃতির নামের তো কথাই নেই, অন্যধর্মীয় লোকেদের আল্লা, খোদা প্রভৃতি নামেরও অনেক মাহাত্ম্য আছে। ভগবানকে লোকেরা যে কোনো নামেই ডাকুক না কেন ভগবান সকলের ভাষা বোঝেন। যে ডাকবে তার একথা মনে রাখা দরকার যে সে ভগবানকে ডাকছে, নাম যাই হোক না কেন। অপ, জল, পানী, নীর, ওয়াটার প্রভৃতির যে কোনো নাম বললেও সেই জলই পাওয়া যাবে। ভগবানের নামের সম্পর্কেও সেই একই কথা। এসব সত্ত্বেও যে সাধক জপ করবেন তার যে নামে বিশেষ রুচি, প্রেম এবং বিশ্বাস থাকে তাঁর কাছে সেই নামই বিশেষ লাভপ্রদ হয়ে থাকে। রাম এবং কৃষ্ণের নামে প্রভেদ নেই, কিন্তু তুলসীদাসের কাছে 'রাম' নাম প্রিয় ছিল আর সুরদাসের কাছে 'কৃষ্ণ' নাম। শ্রদ্ধা এবং প্রেমের তারতম্যে নামের ফল কম বেশি হয়ে থাকে।

নামের মহিমার কথা সকল শাস্ত্রে কীর্তিত হয়েছে। যার যে নামে প্রেম থাকে সে সেই নামেই জপ-কীর্তন করতে পারে। নাম জপ না করা অপেক্ষা যে দুঃখনাশ, ভোগপ্রাপ্তি, এবং মান-সম্মান প্রভৃতির জন্য নামজপ করে সে অনেক ভাল। কিন্তু নামের প্রতিদানে যারা উপরোক্ত লৌকিক ফল চায়

তারা খুবই ভুল করে। আসলে তারা প্রবঞ্চিত হয়। ভগবানের একটি নামের কাছে ত্রিলোকের সকল ঐশ্বর্যও কিছু নয়। সেই নামকে তুচ্ছ বিষয়গুলির জন্য নষ্ট করে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। ত্রিলোকের রাজ্য অনিত্য, ভগবানের নামের ফল নিত্য। নাম জপের ফল তো ভগবৎপ্রাপ্তি। এমন কিছু নামের প্রেমী-মহাত্মা হয়ে থাকেন যাঁরা কেবল নাম-জপের জন্যই তা করেন। তাঁরা ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ ফলও চান না। অতএব ভগবানের যে কোনো নামেরই জপ করা যায়, সব নামই মঙ্গলময়। তবে নিষ্কাম এবং প্রেমের সঙ্গে জপ করা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীভগবান গীতায় সকল যজ্ঞের মধ্যে জ্ঞানযজ্ঞকে শ্রেষ্ঠ বলেছেন।

শ্রেয়ান্ দ্রব্যময়াদ্যজ্ঞাজ্জ্ঞানযজ্ঞঃ পরংতপ।
সর্বং কর্মাখিলং পার্থ জ্ঞানে পরিসমাপ্যতে॥

(৪।৩৩)

'হে অর্জুন ! সাংসারিক বস্তুগুলির দ্বারা সিদ্ধ হয় যেসব দ্রব্যময় যজ্ঞ সেগুলি অপেক্ষা জ্ঞানরূপ যজ্ঞ সব দিক থেকে ভাল ; কেননা হে পার্থ ! সকল কর্ম জ্ঞানেই শেষ হয়ে যায় অর্থাৎ জ্ঞানই হলো তাদের পরাকাষ্ঠা।'

এইভাবে ভগবান জ্ঞানযজ্ঞকে সর্বশ্রেষ্ঠ বলে জানিয়েছেন। কিন্তু তাকে নিজের স্বরূপ বলেননি। কিন্তু জপযজ্ঞকে তো **'যজ্ঞানাং জপযজ্ঞোঽস্মি'** (গীতা ১০।২৫) বলে এই কথাই জানিয়েছেন যে 'সকল প্রকার যজ্ঞের মধ্যে জপযজ্ঞ তো আমিই।'

অতএব ভগবানের যে কোনো নামের জপ যে কোনো কালে, যে কোনো কারণে যে কেউ, যে কোনো ভাবেই করুক না কেন তার দ্বারা পরম কল্যাণ হয়। আর শ্রদ্ধাপ্রেমের সঙ্গে অর্থসহ নিষ্কামভাবে এবং গোপনে যে নামজপ করা হয় তা তৎক্ষণাৎ পরম কল্যাণময় ফলদায়ক হয়ে থাকে। ভগবৎপ্রাপ্তি তো যে কোনোভাবেই নামজপ করলে হয়ে যায়, কিন্তু তা কালান্তরে হয়ে থাকে। হ্যাঁ, অন্তিম সময়ের জন্য কোনো শর্ত নেই। ভগবান পরম দয়ালু। তিনি দয়া করে জীবের জন্য মোক্ষের উপযোগী এই মনুষ্য শরীর দিয়েছেন এবং সেই দয়াময় এই নিয়মও করে দিয়েছেন যে অন্তিম

সময়ে যে তাঁর নাম যে কোনোভাবে স্মরণ করে সে তাঁকে লাভ করবে। কারো ফাঁসির আদেশ হলে যখন সাধারণ সরকারী নিয়ম অনুসারেও মৃত্যুর আগে সেই মানুষটির ইচ্ছা পূর্ণ করবার সুযোগ দেওয়া হয় তখন পরম দয়ালু, পরম সুহৃদ, সর্বক্ষম প্রভু মনুষ্য জীবনের অন্তিম কালে জীবের সঙ্গে এই রকম দয়ার আচরণ করবেন, তা তো ঠিকই।

এমন পরম কারুণিক পরম প্রেমী সর্বশক্তিমান সর্বব্যাপী পরমাত্মাকে ভুলে গিয়ে এক মুহূর্তের জন্যও অন্য কোনো বস্তুর ভজনা অথবা ইচ্ছা করা প্রচণ্ড মূর্খতা ছাড়া আর কিছু নয়। ভগবান স্বয়ং সাবধান করে বলেছেন—

অনিত্যমসুখং লোকমিমং প্রাপ্য ভজস্ব মাম্।

(গীতা ৯।৩৩)

'তুমি সুখরহিত এবং ক্ষণভঙ্গুর এই মনুষ্য-শরীর লাভ করে নিরন্তর আমার ভজনা কর।'

এই কথা থেকে এইটিই প্রকাশিত হয় যে এই শরীর খুবই দুর্লভ হলেও তা বিনাশশীল এবং সুখরহিত। দুর্লভ এইজন্য যে এই শরীরের দ্বারাই পরম কল্যাণ হতে পারে। এমন শরীরকে পেয়ে তো সব সময় ভগবানের ভজনাই করা উচিত। ভজনা না করে অজ্ঞানতাবশত সুখরূপ বলে প্রতীয়মান বিষয় ভোগে মন বদ্ধ হয়ে থাকলে সুখ তো পাওয়া যাবেই না (কারণ ভগবানকে বাদ দিয়ে জগতে কোথাও সুখ নেই, এতো সুখরহিত) এবং অচিরে শরীর বিনষ্ট হয়ে গেলে মনুষ্য শরীরে মুক্তি লাভের যে অধিকার পাওয়া গিয়েছে সেই সুযোগও হাতছাড়া হবে।

এটি মনে রাখা উচিত যে সংসারে ভগবানের ভজনার মতো আর কোনো বস্তু নেই। যিনি এই তত্ত্ব জেনে নেন তিনি তো এক মুহূর্তের জন্যও ভগবানকে ভুলতে পারেন না।

যো মামেবমসংমূঢ়ো জানাতি পুরুষোত্তমম্।
স সর্ববিদ্ভজতি মাং সর্বভাবেন ভারত॥

(গীতা ১৫।১৯)

'হে ভারত! এই প্রকার তত্ত্বের দ্বারা যে জ্ঞানী পুরুষ আমাকে পুরুষোত্তম

বলে মানে সেই সর্বজ্ঞ পুরুষ সর্বরকমে বাসুদেব পরমেশ্বর (আমাকে)-কে ভজনা করে।' কেননা অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের সকল ঐশ্বর্য সুখকে যদি এক দিকে রাখা যায় আর অন্য দিকে ভগবানকে ক্ষণকালের জন্যও জপ অথবা স্মরণকে রাখা যায় তাহলেও তা জপ-কীর্তনের সমান হতে পারে না। অখণ্ড ব্রহ্মাণ্ড তো ভগবানের একটি অংশে স্থিত। ভগবানের সমান তো কেবল ভগবানই এবং ভগবানের নাম ভগবান থেকে অভিন্ন। এইজন্য নাম জপের সঙ্গে কারও তুলনা হতে পারে না। অতএব আমাদের সশ্রদ্ধ নিস্কাম প্রেমভাবে নিত্য-নিরন্তর ভগবানের নাম জপ কীর্তন এবং স্মরণ করা উচিত।

পরলোক এবং পুনর্জন্ম

পরলোক এবং পুনর্জন্মের সিদ্ধান্ত হিন্দুধর্মের নিজস্ব সম্পদ। জৈন এবং বৌদ্ধ ধর্মকেও একভাবে হিন্দুধর্মের শাখা মান্য করা যেতে পারে ; কেননা তারাও এই সিদ্ধান্তকে মানে। এজন্য তারা হিন্দুধর্মের অন্তর্গত। মুসলমান এবং খ্রীষ্ট ধর্ম এই সিদ্ধান্তকে মানে না। তবে থিয়োসাফি সম্প্রদায়ের উদ্যম ও প্রেতবিদ্যা (Spiritualism)-এর চমৎকারিত্ব (এর প্রচার পাশ্চাত্য জগতে কয়েক বছর ধরে যথেষ্ট হয়েছে) এই দিকে লোকেদের মনোযোগ আকৃষ্ট করেছে। আর এখন তো ইউরোপ ও আমেরিকার লক্ষ লক্ষ লোক খ্রীষ্টান হয়েও পরলোকে বিশ্বাস করতে আরম্ভ করেছে। আমাদের ভারতবর্ষের শিশুরাও এই সিদ্ধান্তকে মানে এবং তার আচরণ করে। শুধু তাই নয়, এই সিদ্ধান্ত আমাদের জীবনের প্রত্যেক অঙ্গের সঙ্গে সম্বন্ধিত হয়ে গিয়েছে। আমাদের কোনো ধার্মিক কৃত্য এমন নেই যার প্রত্যক্ষ অথবা অপ্রত্যক্ষরূপে পরলোকের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত নয় এবং আমাদের কোনো ধার্মিক গ্রন্থ এমন নেই যা প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষরূপে পরলোককে সমর্থন না করে। এদিকে

কয়েকটি স্থানে এমন ঘটনাও জানা গিয়েছে যেখানে অবোধ বালক-বালিকারাও তাদের পূর্বজন্মের কথা বলেছে। সেগুলিকে পরীক্ষা করে সত্য বলে জানা গিয়েছে।

আত্মার উন্নতি এবং জগতের ধার্মিক ভাব, সুখ-শান্তি ও প্রেমের বিস্তারের জন্য আর পাপ-তাপ থেকে বাঁচার জন্যও পরলোক এবং পুনর্জন্মকে মানা প্রয়োজন। বর্তমানে সংসারে বিশেষ করে পাশ্চাত্য দেশগুলিতে আত্মহত্যার সংখ্যা প্রতিদিন বৃদ্ধি পাচ্ছে—এখন লোকেদের জীবনে নিরাশ হয়ে, অথবা অসফলতার কারণে দুঃখী হয়ে, অপমান ও অপকীর্তি থেকে বাঁচবার উদ্দেশ্যে কিংবা ইচ্ছার পূরণ না হওয়ায় দুঃখে জলে ডুবে, গলায় দড়ি দিয়ে, আগুনে পুড়ে, বিষ খেয়ে বা গুলি করে প্রাণত্যাগ করার কথা খুবই শোনা যাচ্ছে। এর একমাত্র ও প্রধান কারণ হল আত্মার অমরতায় ও পরলোকে অবিশ্বাস। আমাদের যদি এই বিশ্বাস দৃঢ় হয়ে যায় যে আমাদের জীবন এই শরীরেই সীমিত নয়, পূর্বেও আমরা ছিলাম এবং পরেও আমরা থাকব, এই শরীরকে শেষ করে দিলেও আমাদের কষ্টের অবসান হবে না বরং এই শরীরের ভোগান্তি ছাড়া প্রাণত্যাগ করলে আর আত্মহত্যারূপ নতুন ঘোর পাপ করলে আমাদের ভবিষ্যৎ জীবন আরও বেশি কষ্টকর হবে, তাহলে আমরা কখনই আত্মহত্যা করার সাহস করব না। অত্যন্ত দুঃখের কথা যে পাশ্চাত্যের জড়বাদী সভ্যতার সম্পর্কে আসায় এই পাপ আমাদের আধুনিক শিক্ষাপ্রাপ্ত যুবকদের মধ্যেও বাসা বাঁধছে। আজকাল আমাদের দেশেও এমন কথা শোনা যাচ্ছে। আমাদের শাস্ত্রে আত্মহত্যাকে খুব বড় পাপ বলে মানা হয়েছে এবং তার ফলকে শুকর, কুকুর প্রভৃতি অন্ধকারময় যোনি প্রাপ্তি বলা হয়েছে। শ্রুতি বলেছে—

অসুর্যা নাম তে লোকা অন্ধেন তমসাবৃতাঃ।
তাংস্তে প্রেত্যাভিগচ্ছন্তি যে কে চাত্মহনো জনাঃ॥

(ঈশোপনিষদ্ ৩)

অর্থাৎ সেই অসুর সম্বন্ধীয় লোক (অথবা আসুরি যোনিগুলি) আত্মার

অদর্শনরূপ অজ্ঞানের দ্বারা আচ্ছাদিত। যে আত্মার হননকারী সে তার মৃত্যুর পর সেখানেই যায়।

সংসারে পাপের যে বৃদ্ধি হয়—মিথ্যা, কপটতা, চৌর্য, হিংসা, ব্যাভিচার এবং অনাচার বৃদ্ধি পাচ্ছে—ব্যক্তিদের মতো রাষ্ট্রগুলির মধ্যেও পরস্পর দ্বেষ এবং কলহের বৃদ্ধি হচ্ছে, বলবান দুর্বলকে কষ্ট দিচ্ছে, লোকেরা নীতি ও ধর্মের পথ ছেড়ে দিয়ে অনীতি ও ঐহিক সুখের পথে উঠে আসছে, লৌকিক উন্নতি ও ঐহিক সুখকেই লোকেরা তাদের ধ্যেয় বলে জ্ঞান করছে এবং তারই প্রাপ্তির জন্য সকলে যত্নবান হচ্ছে, বিলাসিতা ও ইন্দ্রিয়লোলুপতা বৃদ্ধি পাচ্ছে, ভক্ষ্য-অভক্ষ্যের বিচার উঠে যাচ্ছে। জিভের স্বাদ ও শরীরের আরামের জন্য অপরকে কষ্ট দিতে এতটুকু পরোয়া করা হয় না, মাদক দ্রব্যের প্রচার বাড়ছে, বেইমানী এবং ঘুষখোরী বেড়ে যাচ্ছে, মানুষের পরস্পরের প্রতি প্রীতি কমে আসছে। মকদ্দমাবাজী বেড়ে চলেছে, অপরাধের সংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে, দম্ভ এবং ভণ্ডামী বৃদ্ধি পাচ্ছে—এই সব কিছুর কারণই হলো লোকেরা বর্তমান জীবনকেই একমাত্র জীবন বলে মেনে নিয়েছে। এরপরেও যে জীবন আছে সেই বিশ্বাস তাদের নেই। এজন্য তারা বর্তমান জীবনকেই সুখী করার প্রচেষ্টায় লেগে আছে। 'যতদিন বেঁচে থাকবে সুখে বাঁচো। ঋণ করে ভাল ভাল জিনিস উপভোগ কর। মরার পর কী হবে তা আর কে দেখেছে ?'[১] আজ প্রায় সমগ্র সংসার এই সর্বনাশকারী স্বীকৃতির দিকে এগোচ্ছে। এই কারণেই তারা সুখের বদলে অধিকতর দুঃখের মধ্যে জড়িয়ে পড়ছে। পরলোক এবং পুনর্জন্মকে না মানার এটি হলো অবশম্ভাবী ফল। আজ আমরা এই পরলোক এবং পুনর্জন্মের বিষয়ে আলোচনা করছি এবং এই সিদ্ধান্তকে যাঁরা মানেন তাঁদের কী কর্তব্য সে কথাও জানাচ্ছি।

উপরেই আমরা বলেছি যে আমাদের সকল শাস্ত্র প্রত্যক্ষ বা

---

[১]যাবজ্জীবং সুখং জীবেদৃণং কৃত্বা ঘৃতং পিবেৎ।
ভস্মীভূতস্য দেহস্য পুনরাগমনং কুতঃ॥ (চার্বাক)

অপ্রত্যক্ষভাবে পরলোক এবং পুনর্জন্মের সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছে। বেদ থেকে শুরু করে আধুনিক দর্শন গ্রন্থগুলি এই সিদ্ধান্তের এক সুরে পুষ্টি সাধন করেছে। স্মৃতি, পুরাণ তথা মহাভারতাদি ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলিতে এই বিষয়ের এত প্রমাণ রয়েছে যে সেই সবগুলিকে যদি সংগ্রহ করা যায় তো তাতে এক বিশাল গ্রন্থ রচিত হতে পারে। তার জন্য অবকাশও তেমন নেই আর তার প্রয়োজন আছে বলেও মনে হয় না। উপনিষদ, গীতা, মনুস্মৃতি, যোগসূত্র প্রভৃতি কয়েকটি নির্বাচিত প্রামাণিক গ্রন্থগুলি থেকে প্রমাণ উদ্ধৃত করে এই সিদ্ধান্তের পুষ্টি করা হবে এবং যুক্তিসিদ্ধভাবে এটিকে সিদ্ধ করার চেষ্টা করা হবে।

কঠোপনিষদের নচিকেতা উপাখ্যান এই সিদ্ধান্তের জ্বলন্ত প্রমাণ। উপনিষদের প্রথম শ্লোকই পরলোকের অস্তিত্বকে সূচিত করে। নচিকেতা যখন দেখেছিল যে তার বাবা বাজশ্রবস ঋত্বিকদের বুড়ি ও অকেজো গরু দান করছে তখন সে আর থাকতে পারেনি। সে ভাবছিল যে এইরকম গরু যারা দিচ্ছে তাদের তো নিরানন্দ লোকেরই প্রাপ্তি হবে—

পীতোদকা জগ্ধতৃণা দুগ্ধদোহা নিরিন্দ্রিয়াঃ।
অনন্দা নাম তে লোকাস্তান্ স গচ্ছতি তা দদৎ॥[২]

(১।১।৩)

এইজন্য সে বাবাকে সে কাজ থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিল। কিন্তু তাতে সে সফল হয়নি। এরপরে তার বাবা যখন রাগ করে তাকে মৃত্যুর কাছে অর্পণ করার কথা বলেছিল তখন সে বাবার আজ্ঞা শিরোধার্য করে যমলোকে চলে গিয়েছিল। এরপর তার এবং যমরাজের মধ্যে যে কথাবার্তা হয়েছিল তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। যমরাজ তাকে তিনটি বর চাইতে বলেছিল। সেগুলির মধ্যে তৃতীয় বর চাইবার সময় নচিকেতা যমরাজকে প্রশ্ন

[২]যে জল পান করতে অক্ষম, যার ঘাস খাওয়া শেষ হয়ে গিয়েছে, যার দুধও দোহন করা হয়ে গিয়েছে আর যার বাচ্চার জন্ম দেওয়ার শক্তিও নেই সেই গরুগুলিকে যে দান করে সেই দাতা আনন্দশূন্য লোকে যায়।

করেছিল—

যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যেঽস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহং বরাণামেষ বরস্তৃতীয়ঃ॥

(১।১।২০)

অর্থাৎ মৃত মনুষ্যের বিষয়ে এই শঙ্কা রয়েছে যে, কেউ বলে থাকে মৃত্যুর পর 'আত্মা থাকে' আবার কেউ বলে যে 'থাকে না'—এই বিষয়ে আপনার উপদেশ চাই, তাতে আমি এই বিষয়ে জ্ঞান লাভ করব। আমার প্রার্থিত বরের এটি হলো তৃতীয় বর।

যমরাজ এই বিষয়টি এড়াতে চেয়েছিলেন এবং বলেছিলেন যে তুমি অন্য বর চাও। কেননা এটি অত্যন্ত গূঢ় বিষয় এবং দেবতাদেরও এই বিষয়ে সংশয় আছে। নচিকেতা একজন সাধারণ জিজ্ঞাসু ছিল না। সেজন্য বিষয়টি গূঢ় একথা শুনে তার উৎসাহ কমে যায়নি, বরং তার উৎসাহ আরও প্রবল হয়েছিল। সে বলেছিল যে সেজন্যই তো তাঁর কাছ থেকে বিষয়টি সে জানতে চেয়েছে, কারণ এই বিষয়ে উপদেশ দেওয়ার যোগ্য তাঁর সমান আর কেউ নেই। তখন যমরাজ তাকে পুত্র-পৌত্র, হাতি-ঘোড়া, স্বর্ণ, বিশাল ভূমণ্ডল, দীর্ঘজীবন, ইচ্ছানুসারে ভোগ, অনুপম রূপ-লাবণ্য বিশিষ্টা স্ত্রী এবং অনেক রকম ভোগ যা মনুষ্যলোকে দুর্লভ সেগুলি দিতে চেয়েছিলেন ; কিন্তু নচিকেতা তার সিদ্ধান্ত থেকে সরে যায়নি। সে বলেছিল—

শ্বোভাবা মর্ত্যস্য যদন্তকৈতৎসর্বেন্দ্রিয়াণাং জরয়ন্তি তেজঃ।
অপি সর্বং জীবিতমল্পমেব তবৈব বাহাস্তব নৃত্যগীতে॥

(১।১।২৬)

'হে যমরাজ ! ভোগ 'কাল থাকবে কি না' এই রকম সংশয়যুক্ত অর্থাৎ যা অস্থির এবং সকল ইন্দ্রিয়ের তেজকে জীর্ণ করে দেয়। এই সমগ্র জীবনও স্বল্পকালীন। অতএব আপনার বাহন (হাতি-ঘোড়া) এবং নাচগান আপনার কাছেই থাকুক, আমার সেগুলির প্রয়োজন নেই।'

নচিকেতার এই রকম আদর্শ নিষ্কামভাব এবং দৃঢ় নিশ্চয় দেখে যমরাজ খুবই প্রসন্ন হয়েছিলেন এবং তাকে প্রশংসা করে বলেছিলেন—

স ত্বং প্রিয়ান্ প্রিয়রূপাঁশ্চ কামানভিধ্যায়ন্নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ।
নৈতাসৃঁঙ্কাং বিত্তময়ীমবাপ্তো যস্যাং মজ্জন্তি বহবো মনুষ্যাঃ॥
(১।২।৩)

'হে নচিকেতা ! তুমি প্রিয় অর্থাৎ পুত্র, ধন প্রভৃতি ইষ্ট পদার্থ এবং প্রিয়রূপ—অপ্সরা প্রভৃতি লোভনীয় ভোগগুলিকে অসার মনে করে ত্যাগ করেছ আর যেসব জিনিসে অধিকাংশ মানুষ ডুবে (ফেঁসে) যায় ধনিকদের সেই নিন্দিত গতিকে তুমি স্বীকার করনি। ধন্য তোমার নিষ্ঠা।'

ন সাম্পরায়ঃ প্রতিভাতি বালং প্রমাদ্যন্তং বিত্তমোহেন মূঢ়ম্।
অয়ং লোকো নাস্তি পর ইতি মানী পুনঃ পুনর্বশমাপদ্যতে মে॥ (১।২।৬)

'যে সব মূর্খ ধনের মোহে অন্ধ হয়ে প্রমোদে লেগে থাকে পরলোকের কথা তাদের মাথায় আসে না। এটিই হল লোক, পরলোক নেই—এইরকম মেনে নেওয়া মানুষেরা কুক্ষিগত হয়ে যায় (জন্মায় এবং মারা যায়)।'

নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ।
যাং ত্বমাপঃ সত্যধৃতির্বতাসি ত্বাদৃঙ্‌নো ভূয়ান্নচিকেত প্রষ্টা॥
(১।২।৯)

'হে প্রিয়তম ! সম্যক জ্ঞানের জন্য মিথ্যা তর্ককারীদের চেয়ে ভিন্ন কোনো শাস্ত্রজ্ঞ আচার্য দ্বারা কথিত এই বুদ্ধি যা তুমি পেয়েছ তা তর্ক দ্বারা প্রাপ্ত হয় না। আহা ! তোমার ধারণা খুবই সত্য। হে নচিকেতা ! তোমার মতো জিজ্ঞাসু যেন আমি সব সময় পাই।'

কামস্যাপ্তিং জগতঃ প্রতিষ্ঠাং ক্রতোরনন্ত্যমভয়স্য পারম্।
স্তোমমহদুরুগায়ং প্রতিষ্ঠাং দৃষ্ট্বা ধৃত্যা ধীরো নচিকেতোঽত্যস্রাক্ষীঃ॥
(১।২।১১)

'হে নচিকেতা তুমি ভোগের সীমা, জগতের প্রতিষ্ঠা, যজ্ঞের অনন্ত ফল, অভয়ের পরাকাষ্ঠা, স্তুত্য (স্তুতির যোগ্য) এবং মহতী গতির প্রতিষ্ঠাকে দেখেও যথার্থ বুদ্ধিমানের মতো সেগুলি ত্যাগ করেছ। সাবাশ।'

উপরোক্ত কথাগুলি থেকে এই বিষয়ের গুরুত্ব এবং তাকে জানার জন্য কত বড় অধিকারের প্রয়োজন সেই কথা দ্যোতিত হয়।

এইভাবে নচিকেতার কঠিন পরীক্ষা নিয়ে এবং তাকে তাতে উত্তীর্ণ হতে দেখে যমরাজ তাকে আত্মার স্বরূপ সম্বন্ধে উপদেশ দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন—

ন জায়তে ম্রিয়তে বা বিপশ্চিন্নায়ং কুতশ্চিন্ন বভূব কশ্চিৎ।
অজো নিত্যঃ শাশ্বতোঽয়ং পুরাণো ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে॥
(১।২।১৮)

'এই নিত্য চিন্ময় আত্মা জন্মায় না, মরেও না ; এটি কোনো বস্তু থেকে সৃষ্ট হয় না এবং নিজে থেকেও সৃষ্ট হয়নি (অর্থাৎ এটি কোনো কিছুর কার্য নয়, কারণও নয়, বিকার নয় ; বিকারীও নয়)। এটি অজন্মা, নিত্য (চিরকাল বর্তমান, অনাদি) শাশ্বত (চিরকালীন, অনন্ত) এবং পুরাতন। আর শরীরের বিনাশ হলেও এ নষ্ট হয় না।[১]

উপরোক্ত বর্ণনায় আত্মার অমরতা প্রমাণিত হয়। তিনি আবার বলেছেন—

হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুঁ হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ঁ্ হন্তি ন হন্যতে॥ (১।২।১৯)

'যদি হত্যাকারী আত্মাকে হত্যা করার কথা ভাবে এবং যে মারা যাবে সে ওকে মৃত মনে করে তাহলে সেই দুজনেই তাকে জানে না। কেননা আত্মা মারে না এবং মারাও যায় না।'[২]

এরপরে যমরাজ যারা আত্মাকে না জেনে মৃত্যুমুখে পতিত হয় সেই সব

---

[১] এই মন্ত্রটিই কিছু ভিন্নভাবে গীতায় আছে। (দেখুন ২।২০)
[২] এই মন্ত্রটিও একটু ভিন্নরূপে গীতাতে দেখা যায়। (দেখুন ২।১৯)

মানুষের গতির কথা জানিয়েছেন। তিনি বলেছেন—

যোনিমন্যে প্রপদ্যন্তে শরীরত্বায় দেহিনঃ।
স্থাণুমন্যেঽনুসংযন্তি যথাকর্ম যথাশ্রুতম্॥

(২।২।৭)

'নিজের কর্ম এবং জ্ঞান অনুসারে অনেক দেহধারী শরীর ধারণ করবার জন্য দেব, মানুষ, পশু, পাখি প্রভৃতি যোনি প্রাপ্ত হয় আবার অনেকে স্থাবরভাব (বৃক্ষাদি যোনি) প্রাপ্ত হয়।'

উপরের মন্ত্র থেকেও পুনর্জন্মের কথা সিদ্ধ হয়।

গীতাতেও পরলোক তথা পুনর্জন্মের প্রতিপাদন করার মতো অনেক কথা পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্য থেকে কয়েকটিকে এখানে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন—

ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।
ন চৈব ন ভবিষ্যামঃ সর্বে বয়মতঃ পরম্॥

(২।১২)

'এমন নয় যে আমি কোনো কালে ছিলাম না অথবা তুমি ছিলে না কিংবা এইসব রাজা ছিল না। আর এমনও নয় যে ভবিষ্যতে আমরা কেউ থাকব না।'

দেহিনোঽস্মিন্ যথা দেহে কৌমারং যৌবনং জরা।
তথা দেহান্তরপ্রাপ্তির্ধীরস্তত্র ন মুহ্যতি॥

(২।১৩)

'যেমন জীবাত্মার এই দেহে শৈশব, যৌবন এবং বৃদ্ধাবস্থা হয় তেমনই অন্য শরীর প্রাপ্ত হয় ; এই বিষয়ে ধীর পুরুষ মোহিত হয় না।'

বাসাংসি জীর্ণানি যথা বিহায় নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।
তথা শরীরাণি বিহায় জীর্ণান্যন্যানি সংযাতি নবানি দেহী॥

(২।২২)

'মানুষ যেমন পুরানো বস্ত্র ত্যাগ করে নতুন বস্ত্র পরিধান করে তেমনই

জীবাত্মা পুরানো শরীর ত্যাগ করে অন্য নতুন শরীর প্রাপ্ত করে।'

চতুর্থ অধ্যায়ে ভগবান অর্জুনকে বলেছেন—

বহূনি মে ব্যতীতানি জন্মানি তব চার্জুন।
তান্যহং বেদ সর্বাণি ন ত্বং বেত্থ পরংতপ॥

'হে পরন্তপ অর্জুন ! আমার এবং তোমার অনেক জন্ম হয়েছে। সেগুলি তুমি জান না, কিন্তু আমি জানি।'

গীতার কয়েক জায়গায় স্বর্গাদি লোকের উল্লেখ আছে। পুনর্জন্ম, পরলোক, আবৃত্তি-অনাবৃত্তি, গতাগত (গমনাগমন) প্রভৃতি শব্দও কয়েক জায়গায় আছে। ষষ্ঠ অধ্যায়ের ৪১-৪২ শ্লোকে যোগভ্রষ্ট পুরুষের দীর্ঘকাল স্বর্গাদি লোকে বাস করে শুদ্ধ আচরণকারী শ্রীমান মানুষের ঘরে অথবা জ্ঞানবান যোনিদের কুলে জন্ম নেওয়ার কথা এবং ৪৫ তম শ্লোকে অনেক জন্মের কথা উল্লিখিত আছে। তেমনই ১৩তম অধ্যায়ের ২৯ তম শ্লোকে মানুষের সৎ-অসৎ যোনিতে জন্ম নেওয়ার কথা বলা হয়েছে। ১৪তম অধ্যায়ের ১৪-১৫তম তথা ১৮ তম শ্লোকে গুণানুসারে মানুষের উচ্চ, মধ্য ও অধোগতি প্রাপ্ত করার কথা আছে। আবার ১৫তম অধ্যায়ে ৭-৮ শ্লোকে শরীর ত্যাগ করে অন্য শরীরে প্রবেশ করার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। ১৬তম অধ্যায়ের ১৬,১৯ ও ২০তম শ্লোকগুলিতে ভগবান আসুরী সম্পদযুক্ত মানুষদের বারংবার তির্যক যোনিতে ও নরকে নিক্ষেপ করার কথা বলেছেন। এইসব প্রসঙ্গেও পুনর্জন্ম ও পরলোকের সিদ্ধান্তের পুষ্টি হয়।

যোগসূত্রেও পুনর্জন্মের বিষয় আছে। মহর্ষি পতঞ্জলি বলেছেন—

ক্লেশমূলঃ কর্মাশয়ো দৃষ্টাদৃষ্টজন্মবেদনীয়ঃ। (সাধন. ১২)

অর্থাৎ 'ক্লেশ'[১] যার মূল সেই কর্মাশয় (কর্মের বাসনা) বর্তমান অথবা ভবিষ্যতের জন্মের ভোগে চলে যেতে পারে।

ঐ বাসনাগুলির ফল কীরূপে পাওয়া যায় তার কথা মহর্ষি পতঞ্জলি

---

[১]যোগশাস্ত্রে অবিদ্যা, অস্মিতা, রাগ দ্বেষ এবং অভিনিবেশ (মৃত্যুভয়) এইগুলিকে 'ক্লেশ' বলা হয়েছে।

বলেছেন—

সতি মূলে তদ্বিপাকো জাত্যায়ুর্ভোগাঃ। (সাধন. ১৩)

অর্থাৎ 'ক্লেশরূপী কারণ থাকা অবস্থায় বাসনাগুলির ফল জাতি (যোনি), আয়ু (জীবনের সীমা) এবং ভোগ (সুখ-দুঃখ) হয়ে থাকে।'

মনুস্মৃতিতেও পুনর্জন্মের প্রতিপাদক অনেক কথা পাওয়া যায়। সেগুলির মধ্য থেকে কয়েকটি নির্বাচিত কথা নিচে উদ্ধৃত করা হচ্ছে। কোন্ কোন্ কর্মের ফলে জীব কোন্ কোন্ যোনি পায় সে বিষয়ে মনু বলেছেন—

দেবত্বং সাত্ত্বিকা যান্তি মনুষ্যত্বং চ রাজসাঃ।
তির্যক্ত্বং তামসা নিত্যমিত্যেষা ত্রিবিধা গতিঃ॥

(১২।৪০)

অর্থাৎ সত্ত্বগুণী লোক দেবযোনি, রজোগুণী লোক মনুষ্যযোনি এবং তমোগুণীরা তির্যগ্যোযোনি পেয়ে থাকে। জীবেদের সব সময় এই তিন রকম গতিই হয়ে থাকে।[১]

'যেসব লোক ইন্দ্রিয়গুলিকে তৃপ্ত করতেই ব্যস্ত এবং ধর্মাচরণে বিমুখ থাকে তাঁদের বিষয়ে ভগবান মনু বলেন যে সেই মূর্খ ও নীচ মানুষেরা মৃত্যুর পর নিন্দিত গতি পেয়ে থাকে।'

এরপরে ভগবান মনু ব্রহ্মহত্যা, সুরাপান, গুরুপত্নীগমন প্রভৃতি কয়েকটি মহাপাতকের উল্লেখ করে এই কথা বলেছেন যে এইসব পাপ যারা করে তারা অনেক বছর নরক ভোগ করে আবার নীচ যোনি পেয়ে থাকে। দৃষ্টান্তস্বরূপ ব্রহ্মহত্যাকারী কুকুর, শূকর, গাধা, চণ্ডাল প্রভৃতির যোনি পায়। ব্রাহ্মণ হয়ে যারা মদিরা পান করে তারা কৃমি-কীট-পতঙ্গ এবং হিংসক যোনিতে জন্ম নেয়। গুরুপত্নীগামী তৃণ, গুল্ম, লতা প্রভৃতি স্থাবর যোনিতে শত শত বার জন্মগ্রহণ করে। আর অভক্ষ ভক্ষণকারীরা কৃমি হয়।[২]

---

[১] ইন্দ্রিয়াণাং প্রসঙ্গেন ধর্মস্যাসেবনেন চ।
পাপান্ সংযান্তি সংসারানবিদ্বাংসো নরাধমাঃ॥ (১২।৫২)

[২] দেখুন মনুস্মৃতি (১২।৫৪-৫৬, ৫৮, ৫৯)

এইভাবে পরলোক ও পুনর্জন্মের অনেক প্রমাণ শাস্ত্রগুলিতে ভরে রয়েছে। সেগুলিকে কত আর লেখা যাবে। এবার যুক্তি সহকারে পরলোক ও পুনর্জন্মকে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

(১) শরীরের মতো আত্মার পরিবর্তন হয় না। অবস্থানুসারে শরীরের পরিবর্তন তো আমরা সবাই দেখতে পাই। আজ আমাদের যে শরীর রয়েছে কয়েক বছর পরে তা একেবারেই বদলে যাবে, তার বদলে অন্য শরীর হয়ে যাবে, যেমন নখ এবং চুল কাটলে আবার নতুন আসতে থাকে। শৈশবে আমাদের দেহের সকল অঙ্গ কোমল এবং ছোট থাকে, উচ্চতা কম থাকে, স্বর থাকে মিষ্টি, ওজনও কম থাকে আর মুখের উপর লোম থাকে না। যুবাবস্থায় আমাদের শরীর আগের চেয়ে শক্ত এবং বড় হয়ে যায়। আওয়াজ ভারী হয়, উচ্চতা বেড়ে যায়, ওজন বৃদ্ধি পায় আর দাড়ি-গোঁফ দেখা দেয়। তেমনই বৃদ্ধাবস্থায় আমাদের শরীর শিথিল হয়ে যায়, শরীরের সৌন্দর্য নষ্ট হয়ে যায়, চামড়া আলগা হয়ে যায়, চুল পেকে যায়, দাঁত আলগা হয়ে গিয়ে পড়ে যায় আর শরীর ও ইন্দ্রিয়গুলির শক্তি ক্ষীন হয়ে আসে। এই কারণেই শৈশব অবস্থায় দেখা কোনো মানুষকে যুবাবস্থায় হঠাৎ চিনতে পারা যায় না। কিন্তু শরীর বদলে গেলেও আত্মার পরিবর্তন হয় না। দশ বছর আগে আমার যে আত্মা ছিল এখনও সেই আত্মাই আছে। তার কোনো পরিবর্তন হয়নি। যদি হোত তাহলে আজ থেকে দশ বা কুড়ি বছর আগের আমাদের জীবনের ঘটনাগুলি আজ আমাদের মনে থাকত না। অপরের অনুভূত সুখ-দুঃখ যেমন আমাদের মনে থাকে না তেমনই আমাদের জীবনের কথাগুলি কালান্তরে আমাদের মনে থাকত না। কিন্তু আজকের ঘটনা আমাদের দশ-কুড়ি বছর পরেও মনে থাকে। তাতে বোঝা যায় যে, যে ব্যক্তি অনুভব করেছিল আর যে ব্যক্তি মনে করছে তারা আলাদা নয়, তারা একই ব্যক্তি। বর্তমান শরীরের এত পরিবর্তন হওয়া সত্ত্বেও যেমন আত্মার পরিবর্তন হয়নি তেমনই মৃত্যুর পর অন্য শরীর পাওয়া গেলেও তার পরিবর্তন হয় না। তাতে আত্মার নিত্যতা প্রমাণিত হয়।

(২) মানুষ তার অনস্তিত্বের কথা কখনও চিন্তা করে না। সে কখনও ভাবে না যে সে একদিন থাকবে না, অথবা সে আগে ছিল না। নিজের অনস্তিত্বের বিষয়ে সে কখনও আত্মার সাক্ষী পায় না। সে একথাই চিন্তা করে যে সে চিরকাল আছে এবং চিরকাল থাকবে। এতেও আত্মার নিত্যতা সিদ্ধ হয়।

(৩) শিশু জন্মানর সঙ্গে সঙ্গে কাঁদতে থাকে আর জন্মাবার পর সে কখনও হাসে, কখনও কাঁদে, কখনও ঘুমায়। আর মা যখন তার মুখে স্তন দেয় তখন সে তা থেকে দুধ টানতে থাকে আর বকলে তাকে ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে কাঁদতেও দেখা যায়। শিশুর এই সব আচরণ পূর্বজন্মের দিকে লক্ষ্য করায়। কেননা এই জন্মে তো সে এইসব করতে শেখেনি। পূর্ব জন্মের অভ্যাসের ফলেই এইসব তার ভিতর স্বাভাবিকভাবেই হতে থাকে। পূর্ব-জন্মের অভিজ্ঞতা মনে করেই সে হাসে এবং কাঁদে। পূর্বজন্মের অনুভূত মৃত্যু-ভয়ের কারণেই সে কাঁপতে থাকে আার পূর্বজন্মের স্তনপানের অভ্যাসেই সে মায়ের স্তনের দুধ টানে।

(৪) জীবের মধ্যে যে সুখ-দুঃখের ভেদ, প্রকৃতি অর্থাৎ স্বভাব এবং গুণকর্মের ভেদ—কাম-ক্রোধ, রাগদ্বেষ প্রভৃতির কমবেশি—এবং ক্রিয়াভেদ ও বুদ্ধিভেদ দৃষ্টিগোচর হয়, তাতেও পুর্বজন্ম প্রমাণিত হয়। একই মা-বাবার সন্তান, এমনকি যমজ সন্তানও সব বিষয়ে একই রকম হয় না। পূর্বজন্মের সংস্কার ছাড়া এই বৈচিত্র্যের অন্য কোনো কারণ হতে পারে না। যেমন গ্রামোফোনের রেকর্ডে গাওয়া কোনো গানকে শুনে আমরা এটি অনুমান করতে পারি যে কোনো মানুষ এই গান অন্যত্র কোথাও গেয়েছিল বলেই তার প্রতিধ্বনি আজ আমরা এই রূপে শুনতে পাচ্ছি তেমনই আজ আমরা যাকে সুখী অথবা দুঃখী দেখি, কিংবা ভাল-মন্দ স্বভাবের তথা বুদ্ধিমান দেখি তাতেও এই অনুমান হতে পারে যে সেই লোকটি পূর্বজন্মে সেই রকম কাজই করে থাকবে। তারই সংস্কার তার অন্তঃকরণে সঞ্চিত আছে এবং সেটিকে সে সঙ্গে করে এনেছে। কাউকে যদি বর্তমান জীবনে

সুখী দেখি তো তার মানে হল এই যে সে পূর্বজন্মে ভাল কাজ করেছিল। আর কাউকে যদি দুঃখী দেখি তো তার অর্থ হল সে পূর্বজন্মে অশুভ কাজ করে থাকবে। স্বভাব, গুণ এবং বুদ্ধি প্রভৃতির সম্বন্ধেও এই কথাই বোঝা উচিত।

যদি কেউ বলে যে সংস্কারের ভিন্নতার জন্য পূর্বজন্মকে মানবার দরকার কী, একে তো ঈশ্বরের ইচ্ছা বলেই মেনে নেওয়া যায় তাহলে তার উত্তর হলো এই যে, যদি এই বৈচিত্র্যের কারণ বলে ঈশ্বরকে মনে করা হয় তাহলে তাঁর মধ্যে বৈষম্য ও নির্দয়তার দোষ আসবে। বৈষম্যের দোষ এই কথায় আসবে যে তিনি নিজের ইচ্ছামতো কাউকে সুখী এবং কাউকে দুঃখী করেছেন আর নির্দয়তার দোষ এই জন্য আসবে যে তিনি কোনো কোনো জীবকে বিনা কারণেই দুঃখী করেছেন। ঈশ্বরে কোনো দোষ আরোপিত হতে পারে না। তাই পূর্বকৃত কর্মকেই লোকেদের স্বভাবের ভিন্নতা ও ভোগের বৈষম্যের কারণ বলে মানতে হবে।

এইসব যুক্তি থেকে এই কথাই প্রমাণিত হয় যে প্রাণীদের পুনর্জন্ম হয়। এখন যখন প্রমাণিত হয়ে গেল যে পুনর্জন্ম হয় তখন দ্বিতীয় প্রশ্ন যেটি উত্থিত হয় সেটি এই যে এইরকম পরিস্থিতিতে মানুষের কী করা উচিত ? চিন্তা করলে বোঝা যায় যে নিরতিশয় সুখলাভ এবং দুঃখ থেকে চিরকালের জন্য মুক্তিই হলো জীবমাত্রের ধ্যেয় এবং তারই জন্য মানুষের যত্নশীল হওয়া উচিত। শাস্ত্রগুলিতে পুনর্জন্মকেই দুঃখের আবাসন বলা হয়েছে এবং পরমাত্মাকে পাওয়াই হলো এই দুঃখ থেকে মুক্তির একমাত্র উপায়। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় বলেছেন—

মামুপেত্য পুনর্জন্ম দুঃখালয়মশাশ্বতম্।
নাপ্নুবন্তি মহাত্মানঃ সংসিদ্ধিং পরমাং গতাঃ॥

(৮।১৫)

‘পরম সিদ্ধিকে প্রাপ্ত মহাত্মারা আমাকে পেয়ে দুঃখের আবাস এবং ক্ষণভঙ্গুর পুনর্জন্মকে পায় না।’

এতে এইটিই প্রমাণিত হয় যে দুঃখ থেকে চিরকালের জন্য মুক্তির একমাত্র উপায় হলো পরমাত্মাকে পাওয়া আর তা মনুষ্যজন্মেই সম্ভব। সুতরাং এই জন্মকে পেয়ে যারা পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করে নেয় তারা এই সংসারে ধন্য এবং তারাই বুদ্ধিমান এবং চতুর। মনুষ্য-জন্ম পেয়ে যারা একে বিষয়-ভোগেই শেষ করে দেয় তারা খুবই জড়মতি, শাস্ত্র তাদের কৃতঘ্ন এবং আত্মঘাতী বলেছে। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান উদ্ধবকে বলেছেন—

নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

(১১।২০।১৭)

'এই মনুষ্য শরীর সমস্ত শুভফলের প্রাপ্তির আদি কারণ এবং অত্যন্ত দুর্লভ হলেও ঈশ্বরের কৃপায় তা আমাদের কাছে সুলভ হয়ে গিয়েছে ; তাতে এই সংসাররূপী সমুদ্রকে পার করা সুদৃঢ় হয়ে গিয়েছে ; তা এই সংসাররূপী সমুদ্রকে পার করার সুদৃঢ় নৌকা। একে গুরুরূপ নাবিক চালায় এবং আমি (শ্রীকৃষ্ণ) বায়ুরূপ হয়ে তাকে এগিয়ে যেতে সাহায্য করি। এমন সুন্দর নৌকো পেয়ে যে মানুষ এই ভবসাগরকে পার করে না সে অবশ্যই আত্মার হননকারী অর্থাৎ সে নিজের পতন ঘটায়।'

তুলসীদাস বলেছেন—

জো ন তরৈ ভব সাগর নর সমাজ অস পাই।
সো কৃতনিন্দক মন্দমতি আত্মাহন গতি জাই॥

(শ্রীরামচরিতমানস, উত্তরকাণ্ড ৪৪)

এখানে এই প্রশ্নটি উত্থিত হয় যে এর জন্য আমাদের কী করা উচিত। এর উত্তর ভগবানের নিজের কথায় আমরা এইভাবে পাই। তিনি বলেছেন—

উদ্ধরেদাত্মনাত্মানং নাত্মানমবসাদয়েৎ। (গীতা ৬।৫)

'মানুষের উচিত নিজেকে সংসার-সমুদ্র থেকে উদ্ধার করা এবং নিজেকে অধোগতিতে না নিয়ে যাওয়া।'

উদ্ধারের অর্থ হলো উত্তম গুণ এবং উত্তম ভাবের সংগ্রহ তথা উত্তম আচরণের অনুষ্ঠান আর পতনের অর্থ হলো দুরাচারকে গ্রহণ করা। কেননা এগুলির দ্বারাই মানুষের ক্রমশ উত্তম কিংবা অধম গতি হয়। এগুলিকে ভগবান ক্রমশ দৈবী সম্পদের নামে ষোড়শ অধ্যায়ে বর্ণনা করেছেন এবং একথাও বলেছেন যে দৈবী সম্পদ মোক্ষের দিকে নিয়ে যায়—**'দৈবী সম্পদ্বিমোক্ষায়'** আর আসুরী সম্পদ বন্ধনকারী অর্থাৎ বারবার সংসারচক্রে পতনকারী হয়—**'নিবন্ধায়াসুরী মতা'**। কেবল তাই নয়, আসুরী সম্পদ বিশিষ্ট লোকেদের আচরণের বর্ণনা করতে গিয়ে ভগবান বলেছেন 'ওই অশুভ আচরণকারী দ্বেষী, ক্রুর (নির্দয়) এবং মানুষদের মধ্যে অধম পুরুষদের আমি সংসারে বার বার পশু-পক্ষী প্রভৃতি তির্যক যোনিতে নিক্ষেপ করি আর জন্ম-জন্মান্তরে সেই যোনি প্রাপ্ত হয়ে সেই মূঢ় লোকেরা আমাকে না পেয়ে তার চেয়েও বেশি অধম গতি (ঘোর নরক)[১] প্রাপ্ত করে। এর দ্বারা এটি স্পষ্ট হয়ে যায় যে উত্তম গুণ, ভাব এবং আচরণই গ্রহণযোগ্য আর দুর্গুণ, দুর্ভাব এবং দুরাচার পরিত্যাজ্য। গীতার ১৩ অধ্যায়ের ৭ থেকে ১১তম শ্লোক পর্যন্ত ভগবান একেই জ্ঞান এবং অজ্ঞান নামে বর্ণনা করেছেন। এখানে জ্ঞানের নামে যে গুণগুলির বর্ণনা করা হয়েছে সেগুলি আত্মার উদ্ধারকারী উপরে তোলার, আর এর বিপরীত যে অজ্ঞান—**'অজ্ঞানং যদতোঽন্যথা'** সেটি পতনকারী, নিচে ফেলে দেয়।

সৎগুণ এবং সদাচারী কী আর দুর্গুণ ও দুরাচার কাকে বলে, গ্রহণযোগ্য আচরণ কী আর পরিত্যাজ্যযোগ্য কাকে বলে—এর নির্ণয় আমরা শাস্ত্রের দ্বারাই করতে পারি। এই বিষয়ে শাস্ত্রই হলো প্রমাণ। ভগবানও গীতায় বলেছেন—

---

[১] তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।
মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥ (১৬।১৯-২০)

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্যাকার্যব্যবস্থিতৌ।
জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম কর্তুমিহার্হসি॥

(১৬।২৪)

'অতএব কর্তব্য-অকর্তব্য নির্ধারণে শাস্ত্রই প্রমাণ। সুতরাং শাস্ত্রোক্ত ব্যবস্থা জেনে তুমি কর্ম সম্পাদন করো।'

যদি নানা প্রকার শাস্ত্র পড়ে এবং সেখানে উল্লেখিত পরস্পরবিরোধী বাক্যে বুদ্ধি বিভ্রান্ত হয় এবং শাস্ত্রের যথার্থ তাৎপর্য নির্ণয় করতে না পারা যায় তাহলে আমাদের মতে অতীতে শাস্ত্রের মর্মার্থ জানেন যেসব মহাপুরুষ তাঁদের প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করা উচিত। শাস্ত্রেও এই আদেশ দেওয়া হয়েছে। মহাভারতকার বলেছেন—

তর্কোঽপ্রতিষ্ঠঃ শ্রুতয়ো বিভিন্না নৈকো ঋষির্যস্য মতং প্রমাণম্।
ধর্মস্য তত্ত্বং নিহিতং গুহায়াং মহাজনো যেন গতঃ স পন্থাঃ॥

(বনপর্ব ৩১৩।১১৭)

'ধর্মের বিষয়ে কোনো প্রতিষ্ঠা (স্থিরতা) নেই। শ্রুতিগুলি বিভিন্ন তাৎপর্যপূর্ণ, ঋষি-মুনিরাও একই কথা বলেননি যাতে তাঁদের মতকে প্রামাণিক বলে মানা যায়। ধর্মের তত্ত্ব গুহায় লুক্কায়িত, অর্থাৎ ধর্মের গতি খুবই গভীর, এজন্য আমার মতে যে পথে মহাপুরুষেরা গিয়েছেন সেইটি হলো পথ। অর্থাৎ মহাপুরুষদের অনুকরণ করাই হলো ধর্ম।' তাঁদের আদর্শকেই নিজেদের আদর্শ বলে গ্রহণ করা উচিত এবং সেই অনুসারে চলার চেষ্টা করা উচিত।

যদি কারো এইরকম মহাপুরুষদের পথেও সংশয় থাকে তাহলে তার উচিত হলো বর্তমান কালের জীবিত কোনো সদাচারী মহাত্মার, যাঁর প্রতি তার শ্রদ্ধা আছে এবং যাঁকে সে শ্রেষ্ঠ মহাপুরুষ বলে মনে করে তাঁকেই নিজের আদর্শ করে নিক এবং তাঁর প্রদর্শিত পথকে গ্রহণ করুক। তাঁর আদর্শানুসারে চলুক। আর যদি কারও প্রতি বিশ্বাস না থাকে তো নিজের

অন্তরাত্মা, নিজের বুদ্ধিকে পথপ্রদর্শক করে নেবে—একান্তে বসে নিরপেক্ষভাবে চিন্তা করবে যে তার লক্ষ্য কী। তাকে কী করতে হবে আর কী করতে হবে না। এইভাবে নিজের হিতাহিত চিন্তা করে, সংসারে তার পক্ষে কোনটি গ্রহণযোগ্য আর কোনটি গ্রাহ্য নয় তা নির্ণয় করতে হবে, তারপর দৃঢ়তার সঙ্গে সেই নির্ধারিত বিষয়ে স্থিত হতে হবে। যে পথ তার ঠিক বলে মনে হবে তাতে সে দৃঢ়তার সঙ্গে স্থিত হয়ে যাবে এবং যে আচরণ সে নিষিদ্ধ বলে মনে করে তা ত্যাগ করতে সে প্রাণপণ চেষ্টা করবে, ভুলেও সে দিকে যাবে না। এইভাবে নিরপেক্ষ হয়ে চিন্তা করার পর অন্তরাত্মাকে প্রশ্ন করলে ভিতর থেকে সে এই উত্তরই পাবে যে অহিংসা, সত্য, ব্রহ্মচর্য এবং পরোপকার প্রভৃতি গুণগুলি হলো শ্রেষ্ঠ। হিংসা, অসত্য, ব্যাভিচার এবং অপরের ক্ষতি করার কথা তার অন্তরাত্মা কখনো বলবে না। প্রচণ্ড নাস্তিকও ভিতর থেকে এই কথাই শুনবেন। এইভাবে নিজের লক্ষ্য স্থির করে নেওয়ার পর তার বিপরীত যেন কোনো আচরণ করা না হয়। ভালভাবে নির্দিষ্ট করা নিজের ধর্ম অনুসারে চলাই হলো আত্মার উত্থান ঘটানো আর সেই সিদ্ধান্ত অনুসারে না গিয়ে তার বিপরীত পথে যাওয়াই হলো তার পতন। যে আচরণ নিজের দৃষ্টিতে এবং অপরের দৃষ্টিতেও হেয় তাকে জেনে বুঝে করা মানে পরে নিজেকেই নিজে ফাঁসিতে চড়ান, নিজের পায়ে নিজে কুড়ুল মারা, নিজের হাতে নিজের ক্ষতি করা। এইজন্য ভগবান বলেছেন—**'নাত্মানমবসাদয়েৎ'** (গীতা ৬।৫)। জেনে বুঝে নিজেই নিজের পতন না ঘটান।

আমাদের শাস্ত্রে মন, বাণী এবং শরীরের দ্বারা হওয়া দোষের কথা বলা হয়েছে এবং সেই সঙ্গে মন, বাণী এবং শরীরের পাঁচটি তপস্যার কথাও বলা হয়েছে। যারা আত্মার উদ্ধার চায় তাদের উচিত হলো উপরোক্ত মন, বাণী ও শরীরের দোষগুলি ত্যাগ করা এবং শারীরিক, বাচিক এবং মানসিক—এই তিন প্রকারের তপ গ্রহণ করা। শরীরের দ্বারা তিনটি

দোষ হয়ে থাকে—না দেওয়া ধন গ্রহণ করা, শাস্ত্রবিরুদ্ধ হিংসা এবং পরস্ত্রী-গমন।[১] বাচিক পাপ চার রকম—কঠোর কথা বলা, মিথ্যা বলা, চুগলী করা এবং মাথামুণ্ডহীন আজে বাজে কথা বলা।[২] মানসিক পাপ তিন রকম—অপরের জিনিস হস্তগত করার চিন্তা করা, মনে মনে অপরের অনিষ্ট চিন্তা করা এবং আমিই শরীর এই রকম মিথ্যা অহংকার করা।[৩]

এই ত্রিবিধ পাপের বিনাশ করার জন্য ভগবান শ্রীকৃষ্ণ গীতায় তিন রকমের তপস্যার কথা বলেছেন—শারীরিক তপস্যা, বাচিক তপস্যা এবং মানসিক তপস্যা। সেই তিন রকম তপস্যার স্বরূপ ভগবান এইভাবে বর্ণনা করেছেন—

দেবদ্বিজগুরুপ্রাজ্ঞপূজনং শৌচমার্জবম্।
ব্রহ্মচর্যমহিংসা চ শারীরং তপ উচ্যতে॥

(গীতা ১৭।১৪)

'দেবতা, ব্রাহ্মণ, গুরু (মাতা, পিতা এবং আচার্য প্রভৃতি) এবং জ্ঞানীজনদের পূজা, পবিত্রতা, সরলতা, ব্রহ্মচর্য এবং অহিংসা—এইগুলিকে শরীর সম্বন্ধীয় তপস্যা বলা হয়।'

অনুদ্বেগকরং বাক্যং সত্যং প্রিয়হিতং চ যৎ।
স্বাধ্যায়াভ্যসনং চৈব বাঙ্ময়ং তপ উচ্যতে॥

(গীতা ১৭।১৫)

'যে ভাষণ উদ্বেগ সৃষ্টি করে না, যা প্রিয় এবং হিতকারী ও যথার্থ তথা বেদশাস্ত্র পঠন এবং নাম-জপের অভ্যাসযুক্ত—তাকেই বাণী সম্বন্ধীয় তপস্যা বলা হয়।'

---

[১]অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্॥ (মনুস্মৃতি ১২।৭)

[২]পারুষ্যমনৃতং চৈব পৈশুন্যং চাপি সর্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাচ্চতুর্বিধম্॥ (মনুস্মৃতি ১২।৬)

[৩]পরদ্রব্যেষ্বভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম মানসম্॥ (মনুস্মৃতি ১২।৫)

মনপ্রসাদঃ সৌম্যত্বং মৌনমাত্মবিনিগ্রহঃ।
ভাবসংশুদ্ধিরিত্যেতত্তপো মানসমুচ্যতে॥
(গীতা ১৭।১৬)

'মনের প্রসন্নতা, শান্তভাব, ভগবৎচিন্তন করার স্বভাব, মনের নিগ্রহ এবং অন্তঃকরণের পবিত্রতা—এইগুলিকে মানস সম্বন্ধীয় তপস্যা বলা হয়।'

প্রত্যেক মঙ্গলাকাঙ্ক্ষী ব্যক্তির উচিত উপরোক্ত তিন রকমের তপস্যা সাত্ত্বিক[১] ভাবে অভ্যাস করা।

শেষে আর একটি কথা বলে এই লেখাটি শেষ করব। দুঃখরূপ সংসার থেকে মুক্তি পাবার সর্বোত্তম উপায় হলো—পরমাত্মার শরণ নিয়ে বিবেক এবং বৈরাগ্যযুক্ত বুদ্ধিতে শোক, ভয় এবং চিন্তা ত্যাগ করা। এতে যদি কেউ বলে যে ভাগ্য অনুসারেই তো সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয় তাহলে তার উত্তর হলো এই সুখ-দুঃখের নিমিত্তগুলিকে পাওয়া এবং না পাওয়া হলো ভাগ্যের ফল। সেই নিমিত্তগুলিকে নিয়ে আমাদের যে চিন্তা, শোক, ভয় এবং বিষাদ হয়ে থাকে তা আমাদের মূর্খতা এবং অজ্ঞানতার কারণে হয়ে থাকে। এইগুলি হওয়ার জন্য ভাগ্য কারণ নয়। পুত্রের মৃত্যু, অর্থের অপহরণ, ব্যবসায়ে লোকসান, মান-সম্মানের হানি, ব্যাধি ও বদনাম—এইসবগুলি ভাগ্যের কারণে হয়ে থাকে, কিন্তু এগুলির জন্য যে দুঃখ হয় তা আমাদের অজ্ঞানের জন্য হয়ে থাকে, ভাগ্যের জন্য নয়। আমরা যদি নিজেরা এই সব ঘটনায় দুঃখী না হই তো এই ঘটনাগুলির সাধ্য নেই যে তারা আমাদের দুঃখী করে। যদি এই সব ঘটনার দুঃখী করার শক্তি হতো তাহলে তো ঐগুলি থেকে জ্ঞানীরাও দুঃখিত হতেন। কিন্তু জ্ঞানী জীবন্মুক্ত মহাপুরুষদের জন্য শাস্ত্র উদাত্ত কণ্ঠে এই কথা বলে যে অতি অপ্রিয়

---

[১] শ্রদ্ধয়া পরয়া তপ্তং তপস্তৎ ত্রিবিধং নরৈঃ।
অফলাকাঙ্ক্ষিভির্যুক্তৈঃ সাত্ত্বিকং পরিচক্ষতে॥ (গীতা ১৭।১৭)

ফলাকাঙ্ক্ষী নন এমন যোগী ব্যক্তিদের দ্বারা পরম শ্রদ্ধায় কৃত উপরোক্ত তিন রকমের তপস্যাকে সাত্ত্বিক বলা হয়।

ঘটনাতেও তারা দুঃখিত হন না। তাঁরা তো সুখ-দুঃখের ঊর্ধ্বে। তাঁদের দৃষ্টিতে প্রিয়-অপ্রিয় বলে কিছু নেই। তাঁদের সম্পর্কে শ্রুতি বলেছে— **'তরতি শোকমাত্মবিৎ'** (ছান্দোগ্যোপনিষদ্ ৭।১।৩)। আত্মাকে যিনি জানেন তিনি শোককে অতিক্রম করে যান। **'হর্ষশোকৌ জহাতি'** (কঠোপনিষদ্ ১।২।১২)। জ্ঞানী ব্যক্তি হর্ষ এবং শোককে পরিত্যাগ করেন, উভয়স্থিতিকে পার করে যান। **'তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ'** (ঈশোপনিষদ্ ৭)—সর্বত্র এক পরমাত্মাকেই যাঁরা দেখেন সেই আত্মদর্শী পুরুষদের কাছে শোক এবং মোহের কোনো কারণ থাকে না। ভগবান গীতাতে অর্জুনকে উপদেশ দেওয়ার প্রারম্ভে বলেছেন—

অশোচ্যানন্বশোচস্ত্বং প্রজ্ঞাবাদাংশ্চ ভাষসে।
গতাসূনগতাসূংশ্চ নানুশোচন্তি পণ্ডিতাঃ॥

(২।১১)

'হে অর্জুন! যাদের জন্য শোক করবার কোনো কারণ নেই তাদের জন্য তুমি শোক করছ এবং পণ্ডিতের মতো কথা বলছ। কিন্তু যাঁরা পণ্ডিত তাঁরা মৃত বা জীবিত কারোর জন্যই শোক করেন না।'

এতে প্রমাণিত হয় যে শোক না করা আমাদের হাতে। যদি এমন না হোত আর তা হোত ভাগ্যের ফলে তাহলে জ্ঞানোত্তর কালে জ্ঞানীরাও শোক করতেন এবং ভগবানও অর্জুনকে শোক ত্যাগ করতে বলতেন না। শরীরের উৎপত্তি-বিনাশ এবং ক্ষয়-বৃদ্ধি তথা সাংসারিক বস্তুগুলির সংযোগ-বিয়োগগুলির ভাগ্যের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকে। সেগুলির জন্য যে চিন্তা, ভয় এবং শোক হয় তা হয় অজ্ঞানের কারণেই। সাংসারিক বিপত্তি ঘটলেও যারা শোক করে না, কাঁদে না তাদের ঐগুলি থেকে কোনো ক্ষতি হয় না। অতএব পরমাত্মার শরণ নিয়ে প্রমাদ, আলস্য, পাপ, ভোগ, শোক-মোহ, বিষাদ-চিন্তা এবং ভয় ত্যাগ করে আমাদের উচিত পরমাত্মায় অচলভাবে স্থিত হয়ে যাওয়া।

——— ০ ———

সৎসঙ্গের অমৃত-কণা

ভগবানের এবং মহাপুরুষদের দয়া অপার। এটি মেনে নিলে তবেই তা বোঝা যায়। কোনো স্থানই এমন নেই যেখানে ঈশ্বর নেই আর মহাপুরুষদের অভাব সংসারে কখনও হয় না। যা ঘাটতি তা হলো আমাদের মেনে নেওয়া, তিনি তো লব্ধ হয়েই আছেন। না-মানায় তিনি প্রাপ্ত হয়েও অপ্রাপ্ত, বাড়িতে পরশ পাথর রয়েছে, কিন্তু না জানলে তা অপ্রাপ্তই থেকে যায়। ভগবানের দয়া এবং প্রেম অপার। তাঁকে না মানলে তা অপ্রাপ্য আর যদি মেনে নেওয়া যায় তাহলেই তা প্রাপ্য। কোনো দয়ালু ব্যক্তিকে যদি বলা হয় যে আপনি আমাকে একটু দয়া করুন তবে তার মানে এই দাঁড়ায় যে সেই ব্যক্তি দয়ালু নন। তাতে সেই লোকটি মনে করবে যে ওই লোকটি খুবই সাধাসিধা, নইলে সে তাকে কেন দয়া করার কথা বলবে ! ভগবান এবং মহাপুরুষদের ক্ষেত্রে এই কথাটি প্রযোজ্য যে তাঁরা সকলের বন্ধু এবং সুহৃদ—

'হেতু রহিত জগ জুগ উপকারী।
তুম্হ তুম্হার সেবক অসুরারী॥'

গীতায় ভগবান স্বয়ং বলেছেন—

সুহৃদং সর্বভূতানাং জ্ঞাত্বা মাং শান্তিমৃচ্ছতি।

(৫।২৯)

'আমাকে সকল প্রাণীর সুহৃদ অর্থাৎ স্বার্থশূন্য দয়ালু এবং প্রেমী—এই কথা তত্ত্বগতভাবে জেনে মানুষ শান্তি লাভ করে।'

সেই সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা সদা সর্বদা সর্বত্র প্রত্যক্ষরূপে বিদ্যমান। কিন্তু এইভাবে প্রত্যক্ষ হওয়া সত্ত্বেও আমাদের না মানার ফলে তিনি অপ্রাপ্ত। সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা কখনও কোথাও অনস্তিত্ব হন না। তাঁকে না মানাই হলো অজ্ঞান আর সেই অজ্ঞানতাকে দূর করতে চেষ্টা করাই হলো পরম

পুরুষার্থ। এই অজ্ঞানতাকে আমাদের দূর করতে হবে। এটি ছাড়া আর কোনো ভাবে পরমাত্মাকে প্রাপ্ত করা যায় না। পরমাত্মা তো নিত্য প্রাপ্ত। সেই প্রাপ্ত পরমাত্মাকেই প্রাপ্ত করতে হবে, অপ্রাপ্তকে প্রাপ্ত করতে হবে না। সেই সচ্চিদানন্দময় পরমাত্মা সদা-সর্বদা সকলের কাছে প্রাপ্ত। এটিকে দৃঢ় নিশ্চয় করে নেওয়াই হলো তাঁকে প্রাপ্ত করা। এই রকম দৃঢ় নিশ্চয় হয়ে গেলে পরম শান্তি এবং পরমপদ প্রাপ্তি চিরকালের জন্য প্রত্যক্ষ হয়ে ওঠে। যদি তা না হয় তবে তা হলো তাঁকে মেনে নেওয়ার ঘাটতি।

এমন তত্ত্ব-রহস্যের কথা জানাবার মহাত্মারাও সংসারে আছেন ; কিন্তু তাঁরা আছেন কোটি কোটি মানুষের মধ্যে কোনোও একজন। যাঁরা আছেন তাঁদের পাওয়া কঠিন আর পেলেও তাঁদের চেনা আরও কঠিন। তাঁদের মানতে পারলে পরমানন্দ ও পরম শান্তি চিরকালের জন্য লাভ হয়। যদি তা না হয় তাহলে বুঝতে হবে তাঁকে মানার বিষয়ে ন্যূনতা আছে।

—— ০ ——

ভগবৎ চিন্তনের প্রভাব

ভগবৎকৃপা বাস্তবে অনুভবের বস্তু বললে তার নিন্দা করা হয়। কেননা আমরা নিজেদের বুদ্ধি মতো যতই অতিরঞ্জন করে বলি না কেন প্রকৃতপক্ষে ভগবৎ কৃপার সহস্রাংসও আমরা বর্ণনা করতে পারি না। যার কাছে যে বস্তু আছে সে তো সেইটিই দিতে পারে, যা তার কাছে নেই সেই বস্তু সে কী করে দেবে—এইটিই তো নিয়ম। ভগবান কৃপালু—**'প্রভু-মূরতি কৃপাময়'**। অতএব তিনি সর্বদা সর্বতোভাবে সকল জীবের প্রতি কৃপা বর্ষণ করেন। সামান্য চিন্তা করলেও ভগবানের এই কৃপা আমরা প্রতি পদে

অনুভব করতে পারি। ভগবান আমাদের মানুষ রূপে সৃষ্টি করেছেন ; পশু, পক্ষী, পিঁপড়া, বৃক্ষ, প্রস্তর রূপে সৃষ্টি করেননি—এতে তাঁর কতই না কৃপা সঞ্চারিত হয়েছে! অনন্ত জন্মের পরে চুরাশি লক্ষ যোনিতে ঘুরে ঘুরে আমরা এই অত্যন্ত দুর্লভ মানব-শরীর ভগবৎ কৃপায় লাভ করেছি—

আকর চারি লচ্ছ চৌরাসী। জোনি ভ্রমত যহ জিব অবিনাসী॥
ফিরত সদা মায়া কর প্রেরা। কাল কর্ম সুভাব গুন ঘেরা॥
কবহুঁক করি করুনা নর দেহী। দেত ঈস বিনু হেতু সনেহী॥

এইভাবে ভগবানের অহেতুক কৃপায় আমরা বিশেষ অধিকারযুক্ত মনুষ্য-যোনি—কর্মযোনি লাভ করেছি। অন্য সবগুলি তো ভোগযোনি, তাতে জীব কেবল ভাগ্যানুসারে কর্মফল ভোগ করবে ; নতুন কর্ম করার জন্য তারা স্বাধীন নয়। আমাদের মোক্ষের দুয়ারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন মুক্তি লাভ করব, নাকি দুয়ার থেকে ফিরে আসব তা আমাদের উপর নির্ভর করে। আমরা ব্যাঙ্কের চেক পেয়ে গিয়েছি এবং টাকা তোলার জন্য ব্যাঙ্কের পথে বেরিয়েছি। রাস্তায় যদি চেকের আমরা অপব্যবহার করি, তাকে ছিঁড়ে ফেলি, পুড়িয়ে ফেলি সে তো আমাদের কত বড় মূর্খতা! চেককে নষ্ট করলুম, তাহলে টাকা কোথায়! ঠিক এমনভাবে আমরা যদি মানবদেহরূপ চেক লাভ করেও ভুল করে অহংকার, কামনা, ক্রোধ, দ্বেষ প্রভৃতির অধীন হয়ে ভগবানকে লাভ না করি তাহলে ভগবানের আদেশানুসারে আমাদের শূকর-কুকুর প্রভৃতি নীচ যোনিতে জন্মাতে হবে এবং শেষে ঘোর নরকে যেতে হবে—

অহংকারং বলং দর্পং কামং ক্রোধং চ সংশ্রিতাঃ।
মামাত্মপরদেহেষু প্রদ্বিষন্তোঽভ্যসূয়কাঃ॥
তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্।
ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি।

মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্॥[১]

(গীতা ১৬।১৮-২০)

অন্তিম শ্লোকে ভগবান বলেছেন—**'মাম্ অপ্রাপ্য'**—আমাকে না পেয়ে। এতে এই প্রশ্ন উত্থিত হয় যে উপরোক্ত আসুর স্বভাবের পুরুষদের ভগবৎপ্রাপ্তি তো দূরের কথা উচ্চ গতিও লাভ হয় না, তারা কেবল আসুরী যোনিই পেয়ে থাকে, তাহলে ভগবান কেন **'মাম অপ্রাপ্য'** কথাটি বলেছেন ? গভীরভাবে চিন্তা করলে এই কথাতে অনেক রহস্য দেখা যায়। ভগবান এখানে পরিস্কার ভাষায় ঘোষণা করেছেন যে মানব যোনিতে জীবেদের ভগবৎপ্রাপ্তির জন্মসিদ্ধ অধিকার আছে। এইরকম অধিকার লাভ করে যদি মানুষ ভগবানকে লাভ না করে তাহলে তা কত বড় দুঃখের কথা ! বাস্তবে ভগবান জীবের এই করুণ অবস্থায় এখানে যেন দুঃখ প্রকাশ করেছেন। এরূপ ভগবৎবচনে এইটিই প্রমাণিত হয় যে আমরা ভগবৎ-প্রাপ্তির সত্যকার পাত্র, প্রকৃত অধিকারী। এত দিন ধরে যদি আমরা তা থেকে বঞ্চিত থাকি তবে তা হলো আমাদের প্রমাদের ফল, আমাদের মূর্খতার পরিণাম। আমাদের প্রতি ভগবানের তো পূর্ণ দয়া, তার বরদহস্ত আমাদের মাথার উপর রাখা আছে আর তিনি দর্শন দিতে প্রস্তুত। কিন্তু আমাদের ভুলের জন্য দেরী হচ্ছে। অতএব প্রয়োজন হলো এই কথার যে আমরা যেন আমাদের ভুলকে ত্যাগ করি এবং নিজেদের জন্মসিদ্ধ অধিকারকে লাভ করে চিরকালের জন্য সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিন্ত হয়ে যাই।

রাজ্যের উপর রাজপুত্রের জন্মগত অধিকার। সন্তান নাবালক। গভর্নমেন্ট কোর্ট অফ ওয়ার্ডস (Court of Wards) নিযুক্ত করে রাজ্যের পরিচালনা

---

[১]অহংকার, বল, দর্প, কামনা ও ক্রোধাদির বশীভূত এবং অপরের নিন্দাকারী ব্যক্তিরা নিজের তথা অপরের শরীরে অবস্থিত আমাকে অর্থাৎ অন্তর্যামীকে দ্বেষকারী হয়ে থাকে। সেই দ্বেষকারী পাপাচারী এবং ক্রূরকর্মী নরাধমদের আমি সংসারে বার বার আসুরী যোনিতেই নিক্ষেপ করি। হে অর্জুন ! ওই মূঢ় ব্যক্তিরা আমাকে লাভ না করে জন্ম জন্মান্তর ধরে আসুরী যোনি পেয়ে থাকে। তারপর তদাপেক্ষা নীচ গতি প্রাপ্ত হয় অর্থাৎ ঘোর নরকে পতিত হয়।

করে। সন্তান যোগ্য হলে তাকে সব অধিকার দিয়ে দেয়। পরমাত্মাকে পাওয়া হলো আমাদের বাবার সম্পত্তি। সুতরাং তার উপর আমাদের জন্মগত অধিকার। পরমাত্মা আমাদের যোগ্য করে তোলেন। সমস্ত 'যোগক্ষেম' নিজে বহন করেন। অতএব আমাদের উদ্ধারের জন্য চিন্তা কী !

লৌকিক জীবনে আমরা দেখি যে যদি রাজকুমার, যাকে অধিকার প্রাপ্ত করতে হবে সে যোগ্য না হয় এবং মারপীট, অগ্নি সংযোগ, চুরি-ডাকাতি প্রভৃতি কুকর্ম করে থাকে তাহলে সরকার তার অধিকার কেড়ে নিয়ে তাকে কারাগারে নিক্ষিপ্ত করে। অথবা প্রয়োজন মনে হলে তাকে নির্বাসিত করে দেয়। রাজকুমারকে এইভাবে অধিকারচ্যুত করতে এবং তাকে দণ্ড দিতে সরকারের যদি খারাপ লাগে তাহলেও তাকে বাধ্যবাধকতার কারণে এই কাজ করতেই হয়। ঠিক এই রকমভাবে যখন আমরা মোহের বশবর্তী হয়ে ছল, কপট, অনাচার, ব্যাভিচার, অত্যাচার, হিংসা প্রভৃতি পাপকর্মে প্রবৃত্ত হই তখন ভগবানকে বাধ্য হয়ে আমাদের দণ্ড দিতে হয় (বাস্তবে ভগবানের দণ্ড বিধানও কৃপায় পরিপূর্ণ থাকে। তিনি যদি মারেন তাহলেও তা করেন উদ্ধার করার জন্য।) কিন্তু ভগবান খুবই অনুশোচনা করেন এই জন্য যে, তিনি পরম পদ প্রাপ্তির জন্য তাকে এত সব সাধন দিয়েছেন তবু সে ভজন, ধ্যান, সেবা, ত্যাগ ইত্যাদি সৎ কর্ম ছেড়ে দিয়ে বিষয়ভোগে আসক্ত হয়ে আছে। তাতে ভগবৎপ্রাপ্তিরূপ নিজের অধিকার হারিয়ে নানা রকম বিষম যন্ত্রণা ভোগ করছে।

বর্ষাকালে দেখে থাকবেন যে প্রদীপ জ্বালাবার সঙ্গে সঙ্গে হাজার হাজার পতঙ্গ চার দিক থেকে উড়ে এসে প্রদীপের শিখার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং নিজের শরীরকে তাতে আহুতি দেয়। যদি কোনো মানুষ তাদের এইভাবে জ্বলতে দেখে দয়া করে প্রদীপটা নিভিয়ে দেয়, তাহলে পতঙ্গরা যে প্রদীপটা নিভিয়ে দিয়েছে তার দয়ার তত্ত্ব না বুঝে মনে মনে তার উপর ক্রুদ্ধ হয়। কথা বলার শক্তি তাদের মধ্যে নেই, যদি থাকত তাহলে তাদের ক্রোধ এবং তাদের দুঃখকে আমরা প্রত্যক্ষ করতাম। তবে তাদের অবশ্যই দুঃখ হয়ে থাকে। অনুরূপভাবে যখন আমরা পতঙ্গের মতো অন্ধ হয়ে বিষয়ভোগে

ফেঁসে গিয়ে নিজেদের সর্বনাশ করতে থাকি তখন ভগবান আমাদের প্রতি কৃপা করে আমাদের মঙ্গলের জন্য সেই ভোগগুলিকে আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নেন। কিন্তু আমরা ভগবানের কৃপা বুঝতে না পেরে খুবই দুঃখিত হই আর কখনও কখনও ক্রোধান্বিত হয়ে ভগবানকে ভালমন্দ বলে ফেলি। যে প্রদীপ নিভিয়ে দেয় তার অপেক্ষা আমাদের প্রতি ভগবানের দয়া এবং করুণা অনন্ত গুণ বেশী। আমরা এই কথাটি বুঝি না ; তাই ভোগের বিনাশ হলে এবং মনের প্রতিকূল অবস্থায় আমরা দুঃখিত হয়ে যাই। অতএব প্রতিকূল এবং অনুকূল সকল অবস্থাতেই ভগবানের অপার কৃপা দর্শন করে আমাদের শোক, চিন্তা, ভয় প্রভৃতি করা উচিত নয়।

সংসার কী ? এক নাট্যশালা, সকল প্রাণী এই নাট্যশালার পাত্র। ভগবান এই নাট্যশালার প্রভু। গভীরভাবে চিন্তা করলে দেখা যাবে যে ভগবান প্রভুও বটেন আবার নাটকের পাত্রও। সকল প্রাণীর রূপে তিনি আমাদের সঙ্গে অভিনয় করছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণও গোপবালকদের সঙ্গে খেলা করেছেন। ভগবান রাম বাঁদর ও ভালুকদের সঙ্গেও ক্রীড়া করেছেন। আর আমরা হলাম মানুষ। অতএব সকল প্রাণীর রূপে নিজেদের প্রভুকে দেখে সকলের সঙ্গে পবিত্র প্রেমের আচরণ করা উচিত। ভগবৎকৃপাকে বোঝবার এইটিই সহজ উপায়।

স্টেজে (মঞ্চে) এসে নিজেদের অভিনয় দেখাবার জন্য সকল প্রকারের সুযোগ দেওয়া হচ্ছে। প্রত্যেকের সময় নির্দিষ্ট থাকে। নিজের নিজের নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে যে যেমন ভালমন্দ অভিনয় করে তাতেই তার সাফল্য বা বিফলতার নির্ণয় হয়ে থাকে। আমাদের তো নিজেদের অভিনয় দেখাবার জন্য সময় পাওয়া গিয়েছে। নির্দিষ্ট সময় হলেই আমাদের মঞ্চ থেকে সরে যেতে হবে। অতএব সময় খুবই মূল্যবান। সেই সময় যদি পেরিয়ে যায় তাহলে কে জানে যে তা আবার কবে আসবে ! কোটি কোটি লোক সুযোগ চাইছে। কে জানে আমাদের পুনরায় কবে সুযোগ আসবে ! নির্দিষ্ট সময় পেরিয়ে গেলে লাখ টাকা দিলেও পাঁচ মিনিট সময় পাওয়া যাবে না। এক সেকেণ্ডও সময় বাড়বার সুযোগ নেই। এজন্য খুব তাড়াতাড়ি কার্য সিদ্ধি

করে নিতে হবে। নাট্যশালার প্রভু পরমাত্মাকে সন্তুষ্ট করার চেষ্টা আমাদের করতে হবে। প্রভু বড়ই দয়ালু, আমাদের খুবই কৃপা করেন। তিনি সমস্ত ত্রুটি মার্জনা করেন। কিন্তু আমাদের এর সুযোগ কখনই নেওয়া উচিত নয়। নিজেদের কাজের দ্বারা স্বামীকে সন্তুষ্ট, তাঁর ইঙ্গিতে নৃত্য করার জন্য আমাদের কাঠের পুতুল হয়ে যেতে হবে। নিজেদের প্রভুর ইঙ্গিত যেন আমরা বুঝতে পারি, আমরা যেন প্রভুর অনুকূল হয়ে যাই। এইটিই হল যথার্থ শরণাগত হওয়া, বাস্তবিক ভক্তি।

ভগবান গীতায় দশম অধ্যায়ের অষ্টম থেকে একাদশ শ্লোক পর্যন্ত প্রভাবসহ ভক্তিযোগের বর্ণনা করেছেন। সেখানে নবম শ্লোকে ভক্তির যে স্বরূপ জানিয়েছেন তা পালন করাই ভগবানের প্রকৃত শরণ নেওয়া। ভগবান বলেছেন—

মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্।
কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ॥

(গীতা ১০।৯)

'যেসব ভক্তজন নিরন্তর আমাতে মন নিয়োজিত করে এবং আমাতেই প্রাণ সমর্পণ করে আমার প্রতি ভক্তির চর্চার দ্বারা নিজেদের মধ্যে আমার প্রভাব জেনে এবং গুণ ও প্রভাবসহ আমার কথাকতা করে সর্বদা সন্তুষ্ট থাকে এবং আমি যে বাসুদেব তাতে রমণ করে।'

এই শ্লোকে ভগবান প্রথম শব্দটি বলেছেন '**মচ্চিত্তাঃ**'। সব সময় আমাতে যে চিত্ত নিয়োজিত করেছে। এর ভাব হলো এই যে ভক্তের উচিত সদা সর্বদা নিজের প্রভু ভগবানের চিন্তা করতে করতে বাজিকরের ঝুমঝুমির মতো সব কাজ করা, বাজিকরের পুতুল সব কাজ করে—চলে-ফেরে, লাফায়, ছোটাছুটি করে ; কিন্তু তার মন সব সময় তার প্রভু বাজিকরের দিতে থাকে। সেই সঙ্গে তার এই কথাও ভালভাবে মনে থাকে যে সে যা কিছু করছে তা সবই বাজিকরের খেলা। সেজন্য কোনো ঘটনায় সে একেবারেই প্রভাবিত হয় না। এইভাবে ভক্তেরও উচিত নিজেকে ঐন্দ্রজালিকের হাতের পুতুল ভাবা এবং জগতের যা কিছু ঘটনা সেগুলিকে

ঐন্দ্রজালিকের খেলা ভেবে নিয়ে অনুকূল-প্রতিকূল যে কোনো পরিস্থিতিতেই মনে আনন্দ বা উদ্বেগকে স্থান না দেওয়া। কায়মনোবাক্যে প্রত্যেকটি বস্তুকে—যার উপর তার অধিকার এবং মমতা আছে বলে সে মনে করে, তাকে ভগবানকে সমর্পণ করে দেওয়া।

নিজের চিত্তকে কী করে ভগবানে নিয়োজিত করা যায়! বাস্তবে তার কোনো দৃষ্টান্ত দেখতে পাওয়া যায় না। তবে বোঝানোর দৃষ্টিতে কিছুটা চকোর পাখির উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে। চকোর তার প্রেমাস্পদ চন্দ্রমাকে সব সময় দেখতে থাকে। তেমনভাবেই আমরা আমাদের ইষ্টদেবতাকে মনঃচক্ষু দ্বারা সব সময় দেখতে থাকব, চিত্তবৃত্তির ধারাকে প্রভু থেকে আমাদের সীমা পর্যন্ত বেঁধে ফেলতে হবে। অন্য কোনো পাখি উড়ে এসে চকোর আর চন্দ্রমার মধ্যে এলে সেই দেখাতে ব্যবধান সৃষ্টি করে দিল। চকোর এই ব্যবস্থা মেনে নেয়, সে মরে না। কিন্তু আমাদের উচিত স্মরণে এই ব্যবধানও স্বীকার না করা। মুহূর্তের জন্য যদি ব্যবধান হয়, এক মুহূর্তও যদি অন্য কথা মনে এসে যায় তাহলে তখনই যেন প্রাণ ছটপট করে এবং তা শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। আমরা জেনে শুনে যেন না মরি, জ্ঞাতসারে মৃত্যু তো পাপ। তবে প্রাণ যেন নিজে নিজেই শরীর থেকে বেরিয়ে যায়। এইটিই হলো যথার্থ প্রেম। যদি এতটা তৎপরতা না থাকে যে বিচ্ছেদ হলে প্রাণ থাকবে না তাহলে তিনি তাকে নিজের করে নেন। কিন্তু এইরকম সুযোগ যে নেয় তার চেয়ে যে তা নেয় না সে গর্বের পাত্র। আমি সুযোগ নিই না, এমন অহংকার করা উচিত নয়। তা না হলে ঐ অহংকারকে দূর করবার জন্য প্রভুকে অন্য কোনো পরিস্থিতি সৃষ্টি করতে হবে। তাতে বাধ্য হয়ে আমাদের ক্ষমা প্রার্থনা করতে হবে। অতএব **'মচ্চিত্তাঃ'**-র এইটিই অর্থ যে যতদূর সম্ভব আমরা যেন নিজেদের দিক থেকে ব্যবধান সৃষ্টি না করি। যদি তা হয়েও যায় তাহলে প্রাণ যেন মাছের মতো ছটপট করে। যদি এমনটা হয়ে যায় তাহলে প্রভু ব্যবধান হতেই দেবেন না। কেননা তাঁর প্রতিজ্ঞা হল—

অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্যুপাসতে।

তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥

(গীতা ৯।২২)

'যে অনন্য প্রেমী ভক্তজন আমাকে অর্থাৎ পরমেশ্বরকে নিরন্তর চিন্তা করতঃ নিষ্কামভাবে ভজনা করে, সেই সদা সর্বদা আমার চিন্তাকারী ব্যক্তিদের যোগক্ষেম আমি নিজে প্রাপ্ত করিয়ে দিই।'

ভগবান বলেছেন—**'যোগক্ষেমম্ অহং বহামি'**—যোগ (অপ্রাপ্তির প্রাপ্তি) আর ক্ষেম (প্রাপ্তের রক্ষা) আমি নিজে বহন করি। এইভাবে ভগবানের প্রাপ্তির জন্য আমরা যেসব প্রয়োজনীয় বস্তু অথবা সাধন পেয়েছি, সকলপ্রকারের বাধাবিঘ্ন কাটিয়ে সেগুলিকে রক্ষা করা এবং যে বস্তু বা সাধন কম আছে সেগুলি পূরণ করে নিজে থেকে সেগুলি পাইয়ে দেওয়া—এই দায়িত্ব ভগবান নিজের উপর নিয়েছেন। তাহলে আমাদের উদ্ধারে সন্দেহ এবং বিলম্ব কী হতে পারে ! ব্যস, প্রয়োজন হলো কেবল সদা-সর্বদা অনন্য মনে চিন্তা করা।

ভগবান এরপরে বলেছেন **'মদ্গতপ্রাণাঃ'**—আমাকেই যাঁরা তাদের প্রাণ অর্পণ করেন। আমাদের প্রাণ শরীরগত। শরীর গেলে প্রাণও যায়। কিন্তু উপরোক্ত প্রকারের ভক্তদের প্রাণের আশ্রয় ভগবানই ; যেমন মাছের প্রাণের আশ্রয় জল। এইসব ভক্ত ভগবানের জন্যই বেঁচে থাকেন। সকল ইন্দ্রিয়ের দ্বারা খাওয়া-দাওয়া, ঘুমানো ইত্যাদি যেসব কাজ করা হয় তা সবই ভগবানের জন্য হয়ে থাকে। সেগুলিতে তাঁর নিজের কোনো প্রয়োজন নেই। পরে তিনি বলেছেন—**'বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্' 'কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যম্'**—আমার প্রতি ভক্তির বিষয়ে আলোচনার দ্বারা নিজেদের উপর আমার প্রভাব এবং তত্ত্বকে জেনে আর গুণ ও প্রভাবসহ আমার কথা বলতে থাকা—বস্তুত এইভাবেই সময় যাপন করা উচিত। এইবার উপরোক্তভাবে যাঁরা ভজন করেন তাঁদের গতির বর্ণনা করেছেন—**'তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ'**—সর্বদা সন্তুষ্ট থাকেন এবং আমার মধ্যে অর্থাৎ বাসুদেবের মধ্যে নিরন্তর রমণ করেন। পতিব্রতা স্ত্রী যেমন কেবল তার পতিতেই রমণ করে, অন্য কোন পুরুষ তার দৃষ্টিতে থাকে না, তেমনই ভক্ত সব সময় ভগবানেই রমণ করে।

অর্থাৎ সর্বদা প্রেমের সঙ্গে ভগবানেরই ভজনা করে। সে ভগবান ছাড়া অন্য কোনো জিনিস চায় না। তার চোখ যেখানেই পড়ে সেখানেই সে ভগবানকে দেখে। গোপীদের যেমন শ্রীকৃষ্ণ দৃষ্ট হতেন—**'জিত দেখৌঁ তিত স্যামমঈ হৈ'**, তেমনই ভক্তের কাছে বাসুদেব সকল বস্তুর মধ্যে ব্যাপকভাবে দৃষ্ট হন। আর সকল বস্তু বাসুদেবের অন্তর্গত। তিনি **'একত্বমাস্থিতঃ'**-কে ভজনা করেন অর্থাৎ ভগবান ছাড়া আর কিছু তাঁর দৃষ্টিতে থাকে না। এইভাবে না তাঁর কাছে কোনো কামনা থাকে, না থাকে কোনো প্রকারের ভয়। তিনি তো সম্পূর্ণরূপে প্রেমের মধ্যে বিচরণ করেন। সারাংশ হলো এই যে ভগবানের গুণ, প্রভাব, তত্ত্ব, রহস্য এবং নাম-রূপ কানে শোনা, কথায় বলা এবং মনে মনন করাই হলো ভক্তের ভগবানে রমণ করা।

সাধকদের উচিত নিজেদের সাধনায় এত মগ্ন হয়ে যাওয়া যাতে তাঁদের কাছে একটি মুহূর্তের বিচ্ছেদও মৃত্যুর মতো হয়ে যায়। উচ্চকোটির ভক্ত কোনো প্রকারের সুযোগ পেতে ইচ্ছা করেন না—তাতে প্রাণ যাক, মুক্তি না পাওয়া যাক, ভগবৎপ্রাপ্তি যদি নাও হয়, তিনি মুক্তির জন্য ভজনা করেন না, ভজনা করবার জন্য ভজনা করেন। তাই এক মুহূর্তের জন্যও চিন্তা বন্ধ হওয়া তাঁর কাছে অসহ্য হয়ে যায়। ভগবানের কাছে তিনি যা চান তা কেবল এই—হে প্রভু, এক মুহূর্তের জন্যও যেন তোমার সঙ্গে আমার বিচ্ছেদ না হয়, আমার এমন অবস্থা হোক যাতে মুহূর্তের বিচ্ছেদও আমি সহ্য করতে না পারি। এমন প্রেমিক ভক্তই মুক্তির আস্বাদ পেতে পারেন। কিন্তু এখন পর্যন্ত আমাদের মধ্যে ভজনার রস জাগ্রত হয়নি। তাই বিচ্ছেদকে আমরা সহ্য করছি। যদি ভজনার রস বুঝতে পারি তাহলে মুহূর্তের জন্যও ভজনা বন্ধ হওয়া সম্ভব নয়। অতএব ভগবানের কাছে আমাদের প্রার্থনা হলো—হে প্রভু, আমাদের এমন করুন যাতে আমরা আপনার চিন্তা থেকে বিচ্ছেদ সহ্য করতে না পারি। ব্যাস, এইটুকু হলেই সব কিছু হয়ে যাবে।

——— ০ ———